এক নারীবাদীর গল্প

এক নারীবাদীর গল্প

অনুপ মহারত্ন

১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

উৎসর্গ

শ্রীচরণকমলেষু,

মা, ‘এক নারীবাদীর গল্প’, বইটা তোমার নামেই উৎসর্গ করলাম। জগতে নারীবাদী হিসেবে মায়েদের ভূমিকা কিছু কম নয়। আমি সে কথাই যেন বলতে চেয়েছি, তুমি যদি পড়ে বল, ‘আমি তা পেয়েছি’, তাহলে বুঝব লেখাটা সার্থক হয়েছে।

তুমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিও। মায়েদের প্রতি সন্তানদের যে চিরকালের অখণ্ড ভালোবাসা থাকে সেটা নিও।

ইতি

তোমার মেজো নন্দন

প্রথমেই পাঠক বন্ধুদের বলে রাখি এ গল্প আমার শোনা। সেটাও খুব নাটকীয় ভাবে। সত্য মিথ্যা প্রশ্ন নাই বা তুললেন, জীবনের অনেক সত্য থাকে, তা গল্পের মতো, আবার অনেক গল্প থাকে যাকে সত্য বলে ভুল হয়। তবে এখানে বলতে আমার সংকোচ নেই, এ গল্প খুবই সত্য, এমনকি আমি, আপনার থেকেও, বাড়ি থেকে বেরিয়ে চৌমাথায় দাঁড়ালে যে সমাজকে দেখা যায় তার থেকেও! আমার এক প্রিয় বন্ধুবর, এক সময় স্কুলের সহপাঠী ছিল, দীর্ঘ স্কুল জীবনের পর, উচ্চশিক্ষার পাঠ চুকিয়ে কলেজের চাকরি নিয়ে কোন এক মফস্সল শহরে বসবাস করছে এইটুকু খবর আমার কাছে ছিল। নামটা একটু সেকেলে ছিল জনমেজয়, মহাকবি ব্যাসদেবের রচনা, নাম রাখাটা ওর দাদুর পছন্দ! আমরা একটু ছেঁটে জয় বলেই ডাকতাম। নামটা সেকেলে হলেও বন্ধুটি বরাবর একালের। খাসা ছেলে, বেশ লম্বা, ফরসা, ছিপছিপে, উজ্জ্বল চোখ, ঝকঝকে চেহারা, যত ভিড়ই হোক চোখ পড়বেই, ওর কথায় যুগপৎ হিউমার ও কাব্য আমাদেরকে আবিষ্ট করে রাখত ক্লাসে— আমরা হাঁ করে তাকিয়ে তাকিয়ে ওর কথা শুনতাম। ও ছিল ক্লাসের সেরা ছাত্র, স্যাররা বলাবলি করত 'এ ছেলে অনেকদূর যাবে', কার্যত বেশিদূর যায়নি দেখে, আমি বড় বিস্মিত বোধ করি। কী করে যেন হঠাৎ করে একযুগ পরে শহরের কাছারি বাজারে দেখা হয়ে গেল আমি জানি না। আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'আরে জয়! কোথায় ছিলি এতদিন?' পার্শ্ববর্তী সহক্রেতারা চিৎকারে চমকে উঠল! এমনকি বিক্রেতাও! ততোধিক চিৎকারে আমাকে জড়িয়ে ধরে জয় বলে উঠল 'আরে অভি, তুই! কত দিন পরে দেখা, কোথায় ছিলি মানে! আমি তো বাসায় মাঝে মাঝে ফিরি, জানিস না? 'সব পাখি ঘরে আসে', দেখ অভি অনেকদিন পর তোর সঙ্গে দেখা হল তোকে

কিন্তু আজ ছাড়ছি না, ঘরে যত বিপত্তিই হোক।' অকস্মাৎ যুগল বন্ধুদ্বয়ের চিৎকারে এবং পরস্পর আলিঙ্গনে বাজারে বিক্রিবাটা প্রায় বন্ধ হওয়ার জোগাড়! আমি বললাম, 'দেখ জয় বহুদিন পর তোকেও আমি পেয়েছি, মনে হচ্ছে ছেলেবেলার সেই স্কুলে ঢোকার গেটে যেন দেখা। সেটা যে কী আনন্দের তোকে নিশ্চয় বোঝাতে হবে না! তোকে ছাড়ার তো কোন প্রশ্নই নেই, তোর কি মনে নেই, স্কুলের সেই দোতলার বারান্দায় একটা কথা বার বার বলতাম, 'প্রাণের সাথে প্রাণে, মিলিয়েছে একতানে!' আজকে সেই দিন, জয়, শোন, আজ বাজার বন্ধ। মোবাইলও বন্ধ। বাড়িতে জানিয়ে দে, আমিও দিচ্ছি।' জয় বললে, 'কোথায় বসবি? এক কাজ কর গোপালদার দোকানে চল, সেই সেউ ভাজা আর চা। আকাশটা দেখ, কি রকম মেঘলা করেছে, বৃষ্টিও আসতে পারে, জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে। মনে হচ্ছে প্রকৃতি যেন দুই পুরাতন অভিন্ন বন্ধু যুগলের বাক্যালাপের জন্য এক নাট্যশালার ব্যবস্থা করে রেখেছে, কালিদাসের পাতায় যেমন আছে, রবির গানেও! মনে পড়ছে গানের সেই অসাধারণ লাইনটা! —'এই পুরাতন হৃদয় আমার আজি, ...'। আমি বললাম, 'জয়, তোকে আর রবি ছাড়ল না, সেই পুরোনো অভ্যাসটা এখনো রয়ে গেছে দেখছি।' এরপর আমরা দুজনে গোপালদার দোকানে যাব বলে রিক্সা খোঁজা শুরু করেছিলাম, জয়ই বললে 'রিক্সা করে যাব। অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা ভাঙাচোরা রিক্সা পাওয়া গেল বটে কিন্তু রেট তিন ডবল। আমরা বললাম, 'বহুৎ আচ্ছা!'। দড়বিহীন রিক্সাবাহনের উৎসাহী দুই যুবা খদ্দেরের আচরণে রিক্সাওয়ালাও কিঞ্চিৎ অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলে, তার চাহনিতে প্রশ্ন একটাই, যা চেয়েছি তা পাব তো! আমরাও স্মিত হাসিতে বুঝিয়ে দিলাম আসন্ন কায়িক পরিশ্রমের লভ্য মূল্যের কোন দুঃশ্চিন্তা নেই। এর পরে রিক্সার কাই কাই শব্দ যেমন বাড়ল তেমনি, সেই সঙ্গে রিক্সার ঘন ঘন চেন পড়ার যন্ত্রণাও দেখা দিল,

তাতে এইটুকু বোঝা গেল আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছাতে কিছু বিলম্ব হবে। রিক্সার কাই কাই আওয়াজ আমাদের কথোপকথনের যেটুকু কথা কর্ণগোচর হল তার সারমর্ম হল এই, আমরা দুজনেই সরকারি চাকরিতে যুক্ত, জয় কলেজের অধ্যাপক, আমি বাতাসপুর স্টেশনের স্টেশন মাস্টার। আমরা দুজনেই দুই মফস্‌সল শহরে থাকি, তবে পিতৃভূমি থেকে বেশি দূরে নয় বাসা করে আছি কিন্তু সংসার পাতা হয়নি। আমি কোয়ার্টারে, জয় থাকে ভাড়া বাসায়।

টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। শ্রাবণ মাস শেষ হতে চলল, শ্রাবণের ধারাটা গেছে কিন্তু টিপ টিপানি রয়ে গেছে। রিক্সা ভাড়া মিটিয়ে আমরা প্রায় দৌড়েই গোপালদার দোকানে ঢুকে পড়ি। 'গোপালদা কেমন আছেন?' বলে দোকানের শেষ প্রান্তে, দেওয়াল ঘেঁসে টেবিলের মুখোমুখি দুজনে বসে পড়লাম। গোপালদার দেখলাম, সেই সশব্দ মৃদু হাসিটা এখনও আছে, বললে 'বহুদিন পর, দুই বন্ধু, কী ব্যাপার, ভাল আছো তো সব?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ গোপালদা, অনেকদিন পর, একটু জমপেশ করে চা আর সেউ ভাজা দিন। গোপালদা বললে, 'লাল চা, না দুধ?' আমি বললাম, 'সেই ঘন দুধের চা, গোপালদা, পুরনো দিনের মতো কবে।' পল্টু কাছেই ছিল। গোপালদা বললে, 'যা পল্টু, ভাল করে দুধ চা, তৈরি করে দাদাদের দিয়ে আয়!' পল্টু দেখলাম, খুব তৎপরতার সঙ্গে চা তৈরিতে বেশ মনোনিবেশ করেছে, সেই সঙ্গে আমরাও দুই বন্ধুতে বহুদিনের জমা অকথিত, অশ্রুত, গল্পে ডুবে গেলাম। এ কথা সে কথা, পরিবারের কথা, মা বাবা ভাই বোনের কথা, স্কুলের দারোয়ান থেকে বড়বাবু নতুন মাস্টার থেকে হেডমাস্টার, বন্ধুদের কথা, চাকরির কথা এমন কি জমি কেনা না কেনার কথা। কত বিচিত্র বিষয় নিয়ে কথা শুরু হল ভাবা যায় না। সব মনেও পড়ছে না। আমি অবশ্য শুনছিলাম বেশি, জয়ই বলছিল। সে যে কী অপূর্ব লাগছিল আমি কী করে বোঝাই! আমি ওর গল্পে

এতটাই মুগ্ধ! মনে হচ্ছিল আমাদের আকৈশোর জীবনের অপ্রকাশিত বই-এর অনিন্দ্যসুন্দর পৃষ্ঠাগুলো যেন উড়ে উড়ে পড়ছে! ষ্টেশনমাস্টারের একঘেয়েমি কর্মজীবনের, হ্যালো হ্যালো শোনার পর জয়ের গল্প যেন অমৃতসমান। কেন জানি, জীবন সম্পর্কে কিছু একটা উপলব্ধি করলাম। আমাদের জীবনটা অনেকটা চারাগাছের মতনই, যেন বেড়ে বেড়ে চলেছে। প্রত্যেক জীবনেরই একটা সারবত্তা আছে, প্রাণ আছে, একটা উৎস আছে, একটা ফলের ফলের মধ্যে যেমন গাছের সমগ্র ইতিহাসের অদৃশ্য কথা যেমন জমে থাকে তেমনি প্রত্যেক মানুষের জীবনে অপ্রকাশিত কিছু ইতিহাস জমে আছে। হঠাৎই দোকানের কালসিটে পড়া দেওয়াল ঘড়িটা চোখে পড়ল। সাড়ে দশটা বাজে, ঘড়ি যে শুধু সময়কে বলে, তা তো নয়, কালসিটে পড়া ঘড়িটার মধ্যেও কিঞ্চিৎ ইতিহাস আছে, স্মৃতি আছে, হয়তো দেখা যাবে গোপালদের ঠাকুরদাদা প্রথম যখন দোকান খোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তার ছাপও বহন করে চলেছে, আমরা ক'জন আর চিন্তা করি! বাইরে চোখ গেল, দেখলাম, মেঘলা আছে তবে বৃষ্টি নেই, বেলা বিশেষ বাড়েনি আবার একটু খিদেও পেয়েছে। গোপালদাকে জিগ্যেস করলাম, 'গরম সিঙাড়া বা জিলিপি কিছু আছে নাকি? গোপালদা বললে, 'আছে।' বললাম, 'পাঠিয়ে দিন'। বন্ধুবরটি বললে, 'এত বেলায় খাবি?' আমি বললাম, 'আজকে আর বেলা টেলা মাপিস না, আজকে তোর কথা শুনে তানিয়ার গলায় সেই গানটা শুনতে ইচ্ছে করছে—'ওগো শোনো কে বাজায়....।' জয় বললে 'গানটা অপূর্ব গেয়েছে। মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানিস, রবীন্দ্রসংগীত আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে।' আমি বললাম, 'একদম ঠিক কথা, আমার ক্ষেত্রে ভীষণ সত্য রেলে তো ছুটি নেই, তুইও জানিস আমিও জানি। যেটুকু পাই ওই গান শুনে কাটাই হঠাৎ বলে উঠলাম, 'আচ্ছা জয়, তুই কোথায় থাকিস। সেটাও তো জানা হয়নি।' জয় বললে, 'ফরাসডাঙায়।' আমি বললাম, 'হেঁয়ালি করছিস

কেন? 'নামটা ঠিক করে বল।' কি যেন, কেন আমার সেই সময় ফরাসডাঙার ভৌগোলিক পরিচয়ের কথা কিছুতেই মনে আসছিল না। উল্টোডাঙা, নারকেলডাঙা, ঝাপানডাঙা এমনকি ভুবনডাঙাও মনে এলো, কিন্তু আশ্চর্য ফরাসডাঙার কথা আর মনে এলো না! পরে জয় বললে, 'চন্দননগর, বন্ধু মনে পড়ল না!' আমি বললাম 'ও, হ্যাঁ, 'ঠিক ঠিক, সে তো খুব ভাল জায়গা। বিয়ে কি ঠিক হয়ে আছে না সন্ধানে আছিস?' জয় বললে, 'তোর কথা বল। স্টেশনমাস্টার, অথচ বিয়ে না করে আছিস কি করে বুঝতে পারি না!' আমি বললাম, 'ধুর বিয়ে আবার আজকাল কেউ করে নাকি! বিয়ে করা মানে তো জোড়া নয়, একটা বড় রকম ভাঙা, সংসার পাতার নাম করে বাবা মা, ভাই বোন, ঘর বাড়ি, পাড়া প্রতিবেশী এমনকি বহুদিনের কাজের মাসিটাকে ছেড়ে চলে যাওয়া, —সেটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, জয়! এর পর বাড়ি থেকে চাপ দিচ্ছে, 'চাকরি করা মেয়ে, চাকরি করা মেয়ে, কান ঝালাপালা করে দিল। সে আবার আরেক বিপত্তি।' জয় বললে, 'কেন, বিপত্তি কেন?' আরে বলিস না, তোরা তো বুদ্ধিজীবী, বিস্তর পড়াশুনাও আছে, আমাদের পড়ার মধ্যে আছে একমাত্র রেলের ওয়ার্কিং টাইম টেবিল, বাংলায় যাকে বলে সময় সারণি, সেটাই আমাদের বাইবেল। বুঝলি জয়, কাগজ পত্রে, টিভি সিরিয়ালে, লোক মুখে নানা রকম, যে সব ঘটনা শুনি বা দেখি, তাতে মনে হয় ঘরে ঘরে সব নারীবাদী গড়ে উঠছে। ভয় করে, এরা সব সময় অধিকার বুঝে নিতে চায়, বিয়ে করে মিছিমিছি অশান্তি ডেকে আনার কি অর্থ বুঝি না!' এ কথা শুনে জয় খুব রেগে গেল। বললে— 'এ সব তত্ত্ব আবার কোথা থেকে পয়দা করলি! তালে শোন এক নারীবাদীর কথা।' আমি হেসে বললাম, 'কি ফরাসডাঙার?' হ্যাঁ বা না, কিছু না বলেই, গোপালদাকে দু কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে আমার প্রিয় বন্ধুবরটি বলতে শুরু করল।

জয়ের গল্প :—

'একদিন, সকাল এগারোটা হবে, কলেজে, ক্লাস নেওয়ার জন্য টিচার'স কমন রুমে বসে আছি, আরও কয়েকজন হবে, কলিগ সব, কেও বই নিয়ে, কেও পত্রিকা দেখছে, এমন সময় একটি ইয়ং ছেলে হন্তদন্ত হয়ে রুমে ঢুকে বললে, 'স্যার একটা কার্ড আছে, আমন্ত্রণ পত্র, টাউনহলে বক্তৃতা, আজ সন্ধ্যেবেলায়, —কোথায় রাখব?' এ কথা শুনে একজন বলে উঠল, 'এখানে কেন বাবা! প্রিন্সিপালের ঘরে দিয়ে আসলেই তো হত!' ছেলেটা বললে —'স্যার, আমি প্রথমেই প্রিন্সিপালের ঘরেই গিয়েছিলাম। উনি পড়ে বললেন, টিচারস্ কমন রুমে দিয়ে দাও। আজকেই অনুষ্ঠান যখন, শিক্ষকরা এখনি জানতে পারবে। তাই নিয়ে এলাম।' আমি বললাম, 'দাও দেখি। 'স্যার যাবেন,' বলে ছেলেটা, আমাকে দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল। প্রিন্সিপালের ত্বরান্বিত পদক্ষেপ আমার কৌতূহলকে বাড়িয়ে দিল। অন্য কলিগদের কী মনে হল জানি না। আমি অবশ্য কার্ডটা পড়তে লাগলাম। বলতে দ্বিধা নেই, আমার বক্তৃতা শোনার আগ্রহ স্বাভাবিকতার থেকে যে খুব বেশি তা কিন্তু নয়, বরং কমই, প্রত্যহ টিভির বিচিত্র চ্যানেলের ত্রিবিধ ভাষায় অসার বক্তৃতার খই, ওরফে কচায়ন, শুনে শুনে বড়ই ক্লান্তিবোধ করছিলাম। আসন্ন সন্ধ্যায় একঘেয়েমির যন্ত্রণা থেকে একটু রিলিফ পাওয়ার আনন্দ আমাকে যেন বাড়তি উৎসাহ জুগিয়েছিল। সদ্য এসছি তাও নয় আবার অনেকদিন ধরে চন্দননগর আছি সেটাও বলা যায় না। কলেজের অনতিদূর ডুপ্লে সরণিতে থাকি। একাই থাকি, ঘরটা বেশ বড়, অথচ ভাড়াটা খুব বেশি নয়। বাড়িওয়ালা সম্ভবত আমাকে সৎপাত্র ধরেই ভাড়াটা কমিয়ে রেখেছে, কিন্তু পাত্রীটি কে, কোনো দিন কিছু বলেননি। এবার একটু কার্ডের কথায় আসি। বেশি কথা নেই, খুবই সাদামাটা, জাগরণী সমিতি কর্তৃক এক বক্তৃতার আয়োজন, সন্ধ্যে সাড়ে ছটা, বিষয়— 'বর্তমান সমাজে নারীর অবস্থান।' বক্তা একজনই, নাম—আয়েশা চ্যাটার্জ্জি। বুঝলাম

আবার সেই, 'নারীবাদ!' জাগরণী সমিতি যে একটা নিছক নারীবাদী সমিতি, সে ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই। জন্মাবধি আমরা সকলেই নারীবাদ নিয়ে প্রচুর শুনেছি, কিঞ্চিৎ পড়েওছি, কি জানি কেন, নারীবাদীর প্রতি একটা অনীহা বহুদিন ধরেই ছিল। ঝাঁঝালো এসেন্সের মত, সব কিছু ছাপিয়ে উগ্রতাই বড্ড বেশি প্রকট। 'কি পাইনি তার হিসাব মেলাতেই...' ব্যস্ত নারী সমাজ, প্রত্যহ ক্ষোভের এক ফর্দ নিয়ে নারীবাদীদের, যে প্রতিবাদী মিছিল শুরু হয় সেটা যে আমার মত এক ব্যাচিলার যুবকের, রোমান্টিক মনের কাছে যে খুব খুশির বার্তা, তা একদমই নয়। কিন্তু গোল বাধলো বক্তার নাম নিয়ে। মনের মধ্যে একটা ঝড় বয়ে গেল। আয়েশা! ও রে বাব্বা! এত শুনেছি মহম্মদের প্রিয়তম ভার্যার নাম। একটা আরবি শব্দ, সেটা হয়ে গেল এক হিন্দু রমণীর, তার উপর ব্রাহ্মণ তনয়া। এ রকম নাম পিতা মাতা রেখেছেন! আমি এতটাই বিস্ময়বিহ্বল, মনে মনে প্রণাম করে ঠিক করলাম, যাব আমি দেখতে, নারীবাদী কে নয়, আয়েশা দেবী কে। দেবী ছাড়া অন্য কোন শব্দে ভূষিত করার মতো কথা আর মাথাতেই এল না। বহু সাহিত্য অল্পবিস্তর পড়েছি এমনকি বাংলা সাহিত্যেও—এ রকম পূর্ণনামের মধ্যে নাস্তিকতার এত স্পষ্ট ছাপ আমি দেখিনি। অভি, আমি তোকে কি করে বোঝাই, ওই মেয়ে তো, নামের সঙ্গে অনেক কিছু ভেঙে বসে আছে। কে এত সাহস জোগাল!'

মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলাম, দোকানে কেউ নেই। মনে হল গোপালদাও আমাদের সঙ্গে আছে। গোপালদার কাছে জল চাওয়াতে একটু যেন থতমত খেল। আমি জয়কে বললাম, সত্যিই কি আয়েশা নাম ছিল, না বানিয়ে বলছিস?' 'অদ্ভুত তো', জয় বললে, 'যে নাম কোন কবির কল্পনাতেও আসেনি সে নাম আমি কি করে বানাব? ঠিক আছে দু কাপ চায়ের কথা বল।' আমি চায়ের অর্ডার দিয়েই জয়কে বললাম, নে শুরু কর, আয়েশার কথা বল, নামেই এতো টেনে ধরেছে,

আর ধৈর্য রাখতে পারছি না।' পরবর্তী অধ্যায় শোনার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে দেওয়াল ঠেসে বসে পড়লাম, চায়ে চুমুক পড়তেই, জয় শুরু করল।

'আমি ঠিকানার জন্য বোর্ডের ছবি মোবাইলে তুলে টেবিলে রাখছি এমন সময় এক কলিগ, কমন রুমে ঢুকে বলতে লাগল, 'কি রায়বাবু কার্ডখানা এখনো ছাড়েননি দেখছি, কিছু তত্ত্ব কথা আছ নাকি?' আমি বললাম, 'না না, টাউন হলের ঠিকানাটা আবার দেখছিলাম', এই বলে, দ্রুত খাতা নিয়ে ক্লাসে চলে গেলাম। কি পড়াব ভেবে পেলাম না, ভার্জিনিয়ার এ রুম অফ ওয়ান'স ওন, নাকি ইবসেনের ডল'স হাউসের এর বিখ্যাত নারীবাদী নোরা? দুটোই সিলেবাসে আছে, কি জানি কেন হয়ত সিলেবাস নির্মাতাদের, নারীবাদের সম্প্রসারণের একটা প্রছন্ন ইঙ্গিত থাকলেও থাকতে পার! সে যা খুশী ইঙ্গিত হোক, আমার 'মিল্লাত' আজ টাউন হলে। কলেজ শেষ করেই দ্রুত বাড়ি যখন ফিরে এলাম ঘড়িতে দেখলাম চারটে বাজে। এসেই ঝোলাটাকে টেবিলে রেখে বাথরুমে ঢুকে, হাত পা ধুয়ে, গামছায় মুখ মুছতে মুছতে যখন বেরিয়ে এলাম— কলিংবেলের ঘণ্টা বেজে উঠল। যাক মনে মনে ভীষণ খুশি হলাম, মাসি ঠিক সময়ে এসেছে। দরজা খুলেই মাসিকে বলে দিলাম—২'কড়া করে একটু চা বানাও দেখি। শোন, আজ বেশি রান্না করো না, যা করবে তাড়াতাড়ি, সন্ধ্যেবেলায় টাউন হলে যাব, একটা অনুষ্ঠান আছে।' রান্না কমপ্লিট হতে প্রায় ছটা হয়ে গেল, মাসিও চলে গেছে, খুব দ্রুত চোখমুখ ধুয়ে, শান্তিনিকেতনী একটা বাটিকের পাঞ্জাবি ও সাদা পায়জামা পরলাম। সঙ্গে ঝোলা ব্যাগটা নিতে ভুললাম না। অনেকটা ঠিক আঁতেল কমরেডের চেহারা নিল। বাঙালি যে জন্মগত যুগপৎ আঁতেল এবং কমরেড সেটা যেন কেউ না ভোলে —আর সেটা বোঝানই ছিল আমার অভিপ্রায়! কেন জানি, সেই সময় আমি একটু এক্সসাইটেড'ও ছিলাম! রাস্তায় একটা অপেক্ষমান

অটো রিক্সায় চেপে বসে বললাম, ‘চালাও ভাই, টাউন হল যাব।’

জয় একটু থামল, হঠাৎ করে কথা বন্ধ হওয়াতে চলমান ট্রেনে ব্রেক কষার মত যেন ধাক্কা লাগল! আমি বললাম, ‘জয়, তোর এই হঠাৎ করে কথা বন্ধ করাটা ছাড়! রসভঙ্গ করিস না, এখন পর্যন্ত আয়েশার কথা কিছুই তো জানতে পারলাম না।’ জয় উত্তরে বললে, ‘অভি, তুই এত অস্থির হচ্ছিস কেন, আমি তো বলার জন্যই আছি ভাই। একি লাটাইয়ের সুতো পেয়েছিস, হু হু করে ছেড়ে দেব, তারপরই ভোকাট্টা। শোন আমি যে সন্ধ্যের কথা বলব, জেনে রাখ অভি, পৃথিবীর খুব কম মানুষের জীবনে এ রকম সন্ধ্যে আসে। যা দুটো গোল্ডফ্লেক সিগারেট নিয়ে আয়, কী বলব এই মুহূর্তে খুব খেতে ইচ্ছে করছে। গল্পের রাশটাকে ধরে রাখতে হবে।’ আমি বললাম, ‘আমাকেও আবেশ করে রেখেছে, জয়, তুই কি এখনও সিগারেট খাস? ঠিক আছে বস, আমি দৌড়ে নিয়ে আসছি!’ সিগারেট শেষ করে জয় শুরু করল।

‘টাউন হলের সামনে যখন অটো দাঁড়াল, তখন ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে ছ’টা বেজে গেছে। হলে ঢুকে দেখি বেশ ভালই ভিড়, চেয়ার ফাঁকা নেই, শ্রোতৃমন্ডলীর বেশির ভাগই মহিলা, পুরুষ খুব কম। ঠিক করলাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনব। খুবই সাদামাটা আয়োজন, আড়ম্বর নেই, একটা পোডিয়াম আছে। স্টেজের পেছনের দিকে জাগরণী সমিতির একটা ফেস্টুন টাঙানো। খালি চেয়ার খুঁজছি এদিক ওদিক এমন সময় একটা ছেলে এসে বললে, ‘স্যার আসুন একটা চেয়ার খালি হচ্ছে।’ আমি একটু দোনামনাই করছিলাম। পাশ থেকে কে যেন বলে উঠল, ‘যান যান এ সুযোগ কেউ ছাড়ে নাকি’! ছেলেটা নিয়ে গেল ঠিকই, বসেও গেলাম, কিন্তু বুঝতে পারলাম না, ও আমাদের কলেজের ছাত্র কিনা! এমন সময় মাইকে ঘোষণা হল, আপনাদের সামনে এবার বক্তব্য রাখবেন, ‘শ্রী আয়েশা চ্যাটার্জ্জি।’ একটু নড়েচড়ে বসলাম,

ব্যাগটাকে কোলের উপর রেখে, হাতদুটো তার উপর রেখে সন্নিবদ্ধ করলাম। মনে মনে বললাম মাননীয়া দেবীর জন্য অনেক ক্ষণ গেছে, ক্লাসটাও ঠিক মতো নিতে পারিনি, দেখা যাক উনি কি রকম ক্লাস নেন— দেখি! এ রকম সাতপাঁচ যখন ভাবছি এমন সময় দেখলাম স্টেজে একজন তন্বী মহিলা, ধীর এবং দৃঢ় পদক্ষেপে মাইকের কাছে এসে নিজের পরিচয় দিলেন। পরিচয় না দিলেও উনি যে আয়েশা দেবী ওটা বুঝতে একদমই দেরি হয়নি। বিষয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেই তিনি বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। প্রথম দর্শনেই বুঝতে পারলাম এ সাধারণ নারী নয়। এত তেজোদীপ্ত চেহারা, জ্বল জ্বল করছে, মনে হল আলোর ছটা যেন, চোখে এসে লাগছে। এত সেই মহিলা, চোখে চোখ রেখে কথা বলা যায় না। এ তো সেই আঁখি, ‘জগৎ পানে চেয়ে রয়েছে’। তাঁর দৃঢ়তায় একটা কথাই যেন ফুটে উঠছে, কোনদিন হারিনি তো! সে যে কী অপূর্ব ভাষণ কী করে বোঝাই তোকে। টানা এক ঘণ্টা! কী করে চলে গেল ধরাই গেল না। অভি, এত তোর রাস্তার মোড়ে, হাত পা ছোঁড়া, প্রতিবাদী নারীবাদীদের বক্তৃতা নয়, এত অভিভাষণ, শুধু নারীকে ঘিরে নয়, মনে হল, সমগ্র সমাজকেই যেন টান দিয়েছে। মনে হল, অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে এ রকম মানুষজনকে কখন ঠেলে আলোর দিকে নিয়ে যাচ্ছে, আবার কখন মনে হল, মহান দার্শনিক কান্টের বৌদ্ধিক জাগরণ ও আত্মনির্ভরতার মধ্যে দিয়ে নারীদেরকে উঠে দাঁড়ানোর আহ্বান। একেধারে শ্রবণ অপর দিকে জাগরণ—উভয়ের মিথস্ক্রিয়ায় এক অলৌকিক বাতাবরণ আমাদেরকে, কী রূপ বিহ্বল করে রেখেছিল, আমি ঠিক বোঝাতে পারব না। ঠিক আছে শোন এবার আয়েশা দেবীর কথা, তুই যে অধীর আগ্রহ নিয়ে বসে আছিস আমি জানি, অভি! তবে আমার স্মৃতিতে বিক্ষিপ্ত ভাবে যেটুকু ধরে রাখতে পেরেছি তারই অনুকথনে সেটুকুই বলতে পারব, অপূর্ণ স্বাদ তোকে হয়ত পেতে হবে, আমি তো থুসিডিয়াসের মত,

গ্রিক ঐতিহাসিক নই যে, বক্তৃতার প্রতিটা শব্দ আমি বলে যেতে পারব! আমার অক্ষমতাকে মার্জনা করিস।'

আমি বললাম, 'জয় কি ভালো লাগছে তোর কথা শুনতে, ভাবতে পারবি না, ঠিকই বলেছিস আমি কিন্তু আয়েশাদির কথার জন্য যেন উদগ্রীব হয়ে আছি! জয় আমি চন্দননগর যাব, তোর বাড়ির ঠিকানা দে।' শুনে জয় হেসে ফেলল, 'অদ্ভুত ব্যাপার! এখন অবধি আয়েশাদির কোন কথাই শুনলি না, এখনই যেতে ইচ্ছে করছে, পরে শুনলে তো চন্দননগরের স্টেশনমাস্টার হয়ে যাবি দেখছি! গেলে অবশ্য মন্দ হবে না! নে, এবার শোন আয়েশাদির কথা।' আমি বললাম, 'ঠিক আছে, শুরু কর!' জয় এবার শুরু করল।

আয়েশার ভাষণ :—

'আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন, জাগরণী সভা কর্তৃক আহুত সুধীবৃন্দকে আমার আন্তরিক ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা জানিয়ে কিছু কথা আপনাদের বলব। আজ আমি আবেগে বড়ই আপ্লুত, আনন্দিত, এবং গর্বিত! কেন জানেন? আমি হুগলি জেলার মেয়ে তার উপর হুগলি জেলার মাটিতে দাঁড়িয়ে বলব নারী সমাজের কথা। অথচ এই হুগলি জেলারই একজন, এমনকি বলা যায় ভারতবর্ষেই যিনি প্রথম, নারীবাদের কথা বলেছিলেন, লড়াইও করেছিলেন। তিনি আবার হুগলি জেলারই সন্তান, রাধানগর গ্রামের, রামমোহন রায়! যিনি নারীশিক্ষা ও নারীর সম্পত্তির অধিকার নিয়ে তৎকালীন সময়ে একটি পুস্তিকাও রচনা করেছিলেন।

আর একজনের নাম আমি বলতে পারি, শুনলে চমকে যাবেন, বলা হয় বঙ্গদেশে এত বড় নারীবাদী, আর জন্মায়নি, তাঁর নাম ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর। ওনার আদি বাড়ি, হুগলি জেলার বনমালীপুর গ্রামে। ওনার পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ ভাইদের সঙ্গে বিবাদ করে বনমালীপুর ছেড়ে বীরসিংহ গ্রামে চলে যান, ঠাকুরদাস, ছোটোবেলায় বনমালীপুরে

টোলের পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করেন। অবাক হবেন না, এ কথা আমার নয়, এ কথা বিদ্যাসাগর নিজেই বলে গেছেন! উক্ত দুই মহান ব্যক্তির কাছে নারী সমাজ যে চিরকাল ঋণী, সেই ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই, কিন্তু কথা হচ্ছে সেই মহান ঐতিহ্য আমরা আর কতটুকু ধরে রাখতে পারব জানি না, আমার অক্ষমতাকে মার্জনা করবেন।

আজকাল কাগজ খুললেই জানা যায় আমাদের দেশে নারীদের অবস্থান! বধূ হত্যা, বধূ নির্যাতন, পারিবারিক হিংস্রতা, আশ্রয়হীনা বিধবাদের উপর অকথ্য নির্যাতন, ধর্ষণ, এমনকি নারীর ক্রয়বিক্রয়ের খবরও থাকে। সেদিন একটা তথ্য দেখলাম, তা পড়লে বা জানলে শুধু আমার কেন, আপনাদেরও ঘুম ছুটে যাওয়ার কথা। পণপথা থেকে যে বিতর্ক, তা থেকে যা দৈহিক নির্যাতন এবং ফল স্বরূপ পনের হাজার বিবাহিত বধূর প্রাণ কেড়ে নেওয়া, এ খবর আমরা ক'জনই বা রাখি! এ ছাড়াও আর একটা বর্বরোচিত খবর আছে, প্রতি বছর আগুনে পুড়ে মারা যায় এ রকম নারীর সংখ্যা প্রায় চার হাজার, তাত্ত্বিকগণ এগুলোকে আবার 'রান্না ঘর মৃত্যু' বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন। কিন্তু সমীক্ষায় দেখা গেছে শতকরা নব্বই ভাগ মৃত্যু আদৌ কোন দুর্ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয়, সিমপ্লি 'কেস অফ মার্ডার। ভারতবর্ষে ধর্ষণের ভয়াবহ ঊর্ধ্বমুখী গ্রাফিক্যাল চিত্রের কথা বলে মনকে আর ভারাক্রান্ত করলাম না! খবরের কাগজে রোজ দেখি, নারীরা কতভাবে পাশবিক লোলুপতায় আক্রান্ত!

'এটা ঠিক, বর্তমানে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, খবরের কাগজ বা দূরদর্শনের সুবাদে আমি, আপনারা, কম বেশি সকলেই জানি নারীর অবস্থা, কিন্তু কেন এই অবস্থা সেটা আবার অনেকটাই অজানা, তারি খোঁজে আমরা বহুদিন ধরেই চলেছি।'

'দেখুন! চিন্তা করলে কী অদ্ভুত লাগে, আমরা স্বাধীনতা পেলাম,

সংবিধান পেলাম, সাম্যের অধিকার, জীবনের অধিকার, পার্লামেন্ট, গনতন্ত্র সুপ্রিম কোর্ট—আরও অনেক কিছু, তা সত্ত্বেও বলা যায় নারীরা যেন অনেক কিছু পায়নি! নিরাপত্তা নেই, স্বতন্ত্র জীবন নেই, অর্থ নেই, সম্পত্তি নেই, সাংসারিক জীবনে যেন শরণার্থীর মর্যাদা পেয়েছে। আবার কখন দেখেছি, সুখী সংসারে স্বীকৃতি পেয়েছে স্বামীর অলংকার হিসাবে, কিন্তু কোনদিন এক মুহূর্তের জন্য স্বরাজ পায়নি।

'আপনারা জানেন, তবু বলি, মনুষ্য সমাজে বহুকাল ধরে, দু ধরনের আইন ছিল এবং বর্তমানেও আছে, এক রাষ্ট্রীয়, দুই ধর্মীয়। দুটোই সমাজে সমভাবে স্বীকৃত হলেও উভয়ের মধ্যে বেশ তফাৎ আছে। রাজার নির্দেশই হোক আর পার্লামেন্টের আইনই হোক, তাকে পরিবর্তন, সংশোধন কিংবা রদ করা যায়। অন্য দিকে ধর্মীয় আইনের মর্যাদা ভিন্ন প্রকৃতির, একে কোনরূপে পরিবর্তনও করা যাবে না আবার সংশোধনও করা যাবে না, ধরা ছোঁওয়ার বাইরে! নারী স্বাধীনতার সব থেকে বড় বাধা যদি কেউ হয়ে থাকে, সেটা রাষ্ট্র নয়, সেটা ধর্মীয় ব্যক্তিগত আইন। একদিকে বৈষম্যমূলক চরম অবনমন আর একদিকে পুরুষতন্ত্রের প্রভুত্ব চিরকালই নারীজাতিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। এই বাঁধন যে কত শ্বাসরোধকারী সে কথা মৃত্যুর তথ্য দিয়ে আগেই জানিয়েছি।'

'আরও আশ্চর্যের কথা কী জানেন, একদিকে যেমন বলা হয় ধর্ম আক্ষরিক অর্থে আমাদের রক্ষা করে আবার এও সত্য ধর্ম আমাদেরকে এক প্রকার বেঁধে রাখে। ধর্ম কথাটির মধ্যে এত স্ববিরোধিতা অন্য কোন শব্দে আমি পাইনি। একটু ধৈর্য নিয়ে শুনবেন, কোন তত্ত্ব কথা নয়, নারীর বাস্তব জীবনের করুণ কাহিনিই বলব।

'ধর্ম এক জিনিস, শাস্ত্রবিধি আবার আর একটা। ধর্মের মধ্যে থাকে বিবেকের প্রশ্ন, শাস্ত্রবিধির মধ্যে থাকে অনুশাসন। ধর্মশাস্ত্র কী করে আইন শাস্ত্রের মর্যাদা পেল, সত্যিই খুব বিস্ময়কর! ইউরোপের কিংবা আমেরিকার ইতিহাসে দেখি, নবজাগরণের ঢেউ ধর্মের একচেটিয়া

আধিপত্যকে অনেকখানি হ্রাস করেছে, সম্পূর্ণ অবলুপ্তি না হলেও, ধর্মকে চার্চের সীমানার বাইরে আসতে দেয়নি। সেই জন্য বিবেকানন্দ যখন আমেরিকায় প্রথম গিয়েছিলেন, সেখানে নারীদের স্বাধীনতা দেখে বেশ অবাক হয়েছিলেন! আমাদের দেশ আবার অন্য কথা বলে, ঔপনিবেশিক ধারা কে বজায় রেখে, মহামান্য হেস্টিংস সাহেবের পরামর্শকে শিরোধার্য করে, আমরা কোনদিনই ধর্মের ব্যক্তিগত আইনকে রাষ্ট্রে আঙিনা থেকে বিমুক্ত করিনি। সংবিধানে সাম্যের অধিকার, জীবনের অধিকারও যেমন আছে, তেমনি ধর্মীয় অধিকারের কথা বলা আছে, কোন ধর্মেরই অনুশাসনকে অস্বীকার করিনি। চেষ্টা যে হয় কী তা বলব না, সাংবিধানিক পরিষদে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে তুমুল তর্ক বিতর্ক হয়েছিল, ধর্মীয় শাসনকে ঠেকা দেওযার জন্য, শেষ পর্যন্ত আর হয়নি। এই সম্পর্কে সংবিধানে একটা ধারা আছে ঠিকই, কিন্তু তার অবস্থা আমাদের মতনই, অস্তিত্ব আছে কিন্তু কোন বাকশক্তি নেই! অভিন্ন দেওয়ানি বিধিকে আইন হিসাবে আর পাইনি, পেয়েছি নীতি হিসাবে, সে আবার বহুকাল সংবিধানের চুয়াল্লিশ নম্বর ধারায় সুপ্ত। সেইজন্য, নারীজাতির উপর বৈষম্য জনিত আঘাত, সেই আগের মতোনই রয়ে গেছে। দেখুন, সংবিধানের মুখবন্ধে স্যেকুলার কথাটা আছে আমরা জানি, কিন্তু চিন্তা করে দেখুন তো, মনের দিক থেকে আমরা কতটা স্যেকুলার হতে পেরেছি? সে উত্তর তো রবিবারের পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপনেই পাই। 'বিবাহের ক্ষেত্রে—'ধর্ম কোন বাধা নয়', —পাত্র পাত্রী বিজ্ঞাপন এইরূপ কথ আপনারা কি কোথাও পেয়েছেন? আমি এখনও পাইনি! এটা বড়ই দুঃখের কথা, অনুতাপের কথা, কিন্তু বলছি না ক্ষোভের কথা। আমাকে ভুল বুঝবেন না, ধর্মের নির্বাসন আমি চাইছি না, আমি চাইছি চিন্তার জগতে যৌক্তিক মনের পুনর্বাসন! সব কিছু একাকার হয়ে যাক, সে কথা বলতে আমি আসিনি। আমি কাউকে রাতারাতি নাস্তিক হওয়ার কথাও বলছি না, কিংবা পুরুষতন্ত্রের

জায়গায় নারীতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার আশ্বাসও দিচ্ছি না। আমাদের লড়াই হল নারীর মর্যাদা ও অধিকারের!'

'মানব সভ্যতার ইতিহাসে মনুষ্য সমাজে দুটো ভাগ আমরা বহুকাল ধরেই দেখছি, পুরুষ ও নারী, কে করল, কি করে হল আমরা জানি না, আমার আশ্চর্য লাগে পূর্বে কোনদিন আমরা ভাগফলের হিসাব নিইনি! আমরা বলতে একটা বিরাট সংখ্যক নারীসমাজকে বলছি। সেই নারীসমাজের ইতিহাস যে কী নির্মম, কী করুণ, কত বিবেকহীন, নৈতিকশূন্য, ভাবা যায় না! এ ইতিহাস যেন কোনো এক আশ্রিতা রমণীর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার ইতিহাস! কত সভ্যতা গেল, কত দার্শনিকের আবির্ভাবও হল, কিন্তু কোথাও কোন বইয়েরর সূচিপত্রে আমরা বিশেষ কোন স্থান পাইনি, ফুটনোটেও নেই! বৌদ্ধিক জগতে যুক্তিবোধের স্বাভাবিক অক্ষমতা, আমাদের সীমাবদ্ধ জীবনের একটা বড় কারণ—এ চিন্তা মানুষ বহুকাল পোষণ করে এসছে। আমরা সমাজের অপাংক্তেয়, আলোচনার বিষয়বস্তু বলে কোনোদিন গণ্য হইনি, এমনকি গালি দেওয়ার মতো সম্মানটুকুও কপালে কোন দিন জোটেনি, দিলে, সেখানে তাকানের প্রশ্ন থাকতো! আমরা চিরকালই পর্দার আড়ালে, উপেক্ষিতা। আমাদেরকে নিয়ে, কেউ কোনদিন মর্যাদার প্রশ্ন তোলেনি। বরং মনুষ্য সমাজের নিত্যব্যবহার্য ভোগ্য পণ্য দ্রব্যের যে বিশাল ফর্দ আছে, তার মধ্যে আমরা কী করে যে স্থান পেলাম, সে সহস্য এখনও আমার কাছে অনাবিষ্কৃত! শিক্ষা ও স্বাধীনতা থেকে চিরকালই বঞ্চিত ছিলাম। কোন যুগের কোন সভ্যতাতেই সমাজের কোন রূপ অবদানের নথিতে নাম রাখেনি! 'বাদ দে ইতিহাস' এই কথাটা বলতে পারি না, আমার বিষয় যতই বর্তমান নারীদের নিয়ে হোক না কেন। ইতিহাসকে আমি সবসময় আলোচনার মধ্যে রাখি। তার কারণ, বর্তমান তো হঠাৎ করে জন্মায় না, ইতিহাসের পাতা থেকে গড়িয়েই তো বর্তমানকালের আবির্ভাব। কোন এক গ্রিক দার্শনিক

বলেছিলেন, 'জগতে পরিবর্তনই একমাত্র সত্য', আশ্চর্যের বিষয়, নারীর ইতিহাস অন্য কথা বলে— অপরিবর্তনই নারী সমাজের একমাত্র সত্য!

ইউরোপে আধুনিক যুগের সূচনা বহুকাল আগেই, ষোড়শ শতাব্দী, অর্থাৎ রেনেসাঁ পিরিয়ড, সেই পিরিয়ডেরই একটি গল্প বলব, সেখান থেকে জানতে পারব মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম নারীবাদীকে কোথায় আমরা প্রথম পেয়েছিলাম!

কিছু মনে করবেন না, আমি আর বেশিক্ষণ ধরে রাখব না, আমি জানি অনেকেই বাসে করে এসেছেন, রাত্রে বাড়ি ফিরতে হবে, তবু কেন যেন মনে হয় এই সব কথা শুনলে আপনাদেরকে উজ্জীবিত করবে, মনে সাহস জোগাবে, এবং আগামী দিনে নারীবাদী আন্দোলনের যে কর্মসূচী আমাদের কাছে আছে, তাতে প্রেরণা জোগাবে। এই গল্পটা বলেই শেষ করব। বাড়ি যাওয়ার আগে আমাদের কর্মসূচীটা নিয়ে যাবেন, লিফলেট আকারে, বেরোবার সময় গেটে পেয়ে যাবেন। আপনাদের সাথে নিয়েই লড়াই, আপনারা না থাকলে এই সব বক্তৃতার কোন মানেই থাকে না। জানি আমি, এটা দু একদিনের লড়াই নয়, 'বহু শতাব্দীর কাজ।' হোক, আমি প্রস্তুত বহু যুগের জন্য, প্রতীক্ষায় থাকব তবে লড়াই বিমুখ কোনদিনই নয়। বর্তমানে বড়ই শ্লাঘার কথা, আমার এবং আপনাদের এই উপলব্ধি এখন সহজাত, নারীজাতির নারী বলে তো আর কেউ জন্মায় না, এখন একটাই জাতি—মনুষ্য জাতি! ঠিক আছে এবার কাহিনিটা শুরু করা যাক।'

হিপসিয়ার গল্প:—

'রাফেলের নাম আমরা কম বেশি সবাই শুনেছি, ইটালির বিখ্যাত চিত্রকর, বড় মাপের আর্টিস্ট, ষোড়শ শতাব্দীর। তাঁর আঁকা অনেক দেওয়াল চিত্র আছে যাকে আমরা ফ্রেসকো বলে থাকি। তেমনি একটা

চিত্র আছে যার নাম 'স্কুল অফ এথেন্স'। গ্রিক ওয়াল্ডের বিখ্যাত বিখ্যাত মনীষীদেরকে নিয়ে এই চিত্র। এ ছবি যে কী আসাধারণ, আমি কেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকও বোঝাতে পারবে না! বৌদ্ধিক মনন ও শিল্প নৈপুণ্যের প্রতিভা কতদূর গেলে এ রকম ছবির সৃষ্টি হতে পারে তা আমার বুদ্ধির অগম্য!

এথেনসের প্রাচীন সভ্যতাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সভ্যতা হিসবেই ঐতিহাসিকরা বলে থাকেন, আর শ্রেষ্ঠ সভ্যতার শ্রেষ্ঠ মনীষীগণই যে স্কুল অফ এথেন্সে জায়গা পেয়েছে তা বলা বাহুল্য। আবার তাঁরাই যে যুগ যুগে ধরে লাইব্রেরির অসংখ্য গ্রন্থরাজির মধ্যে জায়গা নিয়ে আছে সে কথা কে অস্বীকার করবে? একদিন হল কী! কী জানি কেন! আমার একটা অদ্ভুত কৌতূহল হল— দেখিতো, 'স্কুল অফ এথেন্সে' কোন মেয়ের ছবি আছে কি না? তারপর আমি সত্যিই, নিবিষ্ট মনে রাফেলের অনন্য অঙ্কন চিত্রটি অনেকক্ষণ ধরে দেখছিলাম। প্লেটো, অ্যারিস্টটল, সক্রেটিস, ডেমোক্রেটাস , হেরোক্রিটাস , আরো অনেকের মাঝে প্রথমে হারিয়েই ফেললাম, এত সব পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ, রোমাঞ্চকর ব্যক্তিত্ব ভাবা যায় না! হঠাৎ খেয়াল করলাম, ছবির এক কোনে সাদা পোশাকে অপূর্ব সুন্দরী এক রমণীর ছবি, দাঁড়িয়ে আছে, প্রথমে ভাবলাম কোন দেবতা টেবতা হবে, ভাল করে দেখলাম, কিন্তু কোন গ্রিক দেবদেবীর মিল পেলাম না, পরে বুঝলাম এটা কোন দেবীর নয়, এক মানবীর ছবি, শান্ত অপলক দৃষ্টি দিয়ে দর্শকের দিয়ে তাকিয়ে আছে। পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম এই অপূর্ব গ্রিক রমণীয় নাম হিপসিয়া। নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে একজন হলেও যে নারী হিসাবে স্থান পেয়েছে এটা দেখে ভীষণ আনন্দ পেলাম, মনে মনে রাফেলকে দুবার প্রণামও করলাম। তখনও আমি মেয়েটি কে! কী পরিচয়, কিছুই জানতাম না, শুধু নামটা জেনেছিলাম। এবার একটু ছবিটার ইতিহাসটা জেনে নিই।'

'১৫০৯ সালে ভ্যাটিক্যান শহরের এক ধর্মযাজক রাফেলকে হঠাৎ

তলব করল। রাফেলের তখন তরুণ বয়স, চিত্রকর হিসাবে ইটালিতে বেশ নামও হয়েছে। রাফেলকে বলা হল নব নির্মিত এপোসটোলিক প্যালেসের অতিথি অভ্যর্থনা হলের শোভাবর্ধনের জন্য একটা দেওয়াল চিত্র অর্থাৎ যাকে ইংরেজিতে বলে ফ্রেসকো, সেরকম বড় মাপের অপূর্ব দৃশ্যমান প্লাসটার চিত্রকলার নির্দশন রাখতে হবে। এপোস্টোলিক প্যালেস হচ্ছে খ্রিস্টধর্মের চূড়ামণিতে যিনি অধিষ্ঠিত, সেই মহান পোপের সরকারি নিবাস। একটা বড় মাপের কাজ, রাফেল রাজি হয়ে গেল, মনে মনে ঠিক করল, স্কুল অফ এথেন্সই আঁকব। সময়টা ছিল, মধ্যযুগের শেষ অধ্যায়, ইটালিতে নবজাগরণের ঢেউ আছড়ে পড়েছে ঠিক কথা, কিন্তু হাজার বছরের ধর্মের প্রভাব কিছুটা হলেও রয়ে গেছে। ছবির বিষয় নির্বাচনে রাফেল যে নবজাগরণের সর্বশ্রেষ্ঠ ঢেউটা আনতে চেয়েছিল সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তৎকালীন খ্রিস্ট্রিয়ধর্মের অনুশাসনই ছিল এই রকম, চিত্রকর সে যেই হোক, ছবি আঁকব বললেই চলবে না, আগে বিশপের অনুমোদন সাপেক্ষে সেই ছবির চরম ছাড়পত্র পাবে। যে কোনে চিত্রকরের পক্ষে এ ধরনের নিয়ম খুবই অপমানকর। সেটা যে রাফেলের মতো চিত্রকরের কাছে কত ভয়ংকর, ভাবলে এখনও আমি অবাক হই। একদিন বিশপ রাফেলকে ডেকে পাঠাল ছবিটার প্রাথমিক খসড়াটা নিয়ে আসার জন্য! বিশপ 'স্কুল অফ এথেন্সের' খসড়া ছবি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, দেখতে দেখতে হঠাৎ রাফেলকে প্রশ্ন করল, ছবির মাঝখানে এই সুন্দরী রমণীটি কে? ও আবার কোথা থেকে এল? রাফেল বললে—স্যার, আলেক্সজেনড্রিয়ার হিপসিয়া, স্কুল অফ এথেন্সের খুব নাম করা স্টুডেন্ট, গ্রিক রমণী, আলেক্সজেনড্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের এবং অঙ্কের বিখ্যাত প্রফেসর, আলেক্সজেনড্রিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদদের মধ্যে একজন। এই কথা শুনে বিশপ আদেশ করলে— না না, ওকে রাখা যাবে না, ওকে মুছে দাও। অর্থাৎ নারী যেই হোক ওর কোন মূল্য নেই! ইতিহাসের সাক্ষ্য

অবশ্য অন্য কথা বলছে, রাফেল সেই আদেশ সম্পূর্ণ মানেনি, হিপসিয়াকে ছবির মাঝখান থেকে সরিয়ে এক সাইডে রেখেছিল মাত্র! একদম তুলে না দিয়ে, একটু পাশে সরিয়ে রাখাটার মধ্যে রাফেলের ব্যক্তিত্বের কী অনন্যসাধারণ মানবিক চিন্তার প্রকাশ, তা বলে বোঝানো যাবে না! আমার মতে, সর্ব কালের, সব নারীসমাজই রাফেলের কাছে ঋণী। এবার হিপসিয়ার করুণ ইতিহাসটা বলে বলা শেষ করব, মনে রাখবেন এটা নিছক গল্প নয়, এ ইতিহাস সত্য!

আমরা সবাই আলেক্সজেনড্রিয়া নগরের ইতিহাস কিঞ্চিৎ জানি। গ্রিক সম্রাট আলেক্সজেন্ডার বিশ্বজয় করতে করতে যখন মিশরের ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে এলেন এবং এই অঞ্চলের অপূর্ব নৈসর্গিক দৃশ্য দেখে তিনি এতটাই মোহিত হয়েছিলেন যে মনে মনে ঠিক করলেন, —এটাই হবে দ্বিতীয় এথেন্স রচনার সবথেকে উপযুক্ত জায়গা। শহরের পত্তন তিনিই করলেন, তাঁর নামেই শহরের নাম হলো আলক্সজেনড্রিয়া। ইতিহাস বলে তাঁর স্বপ্ন ও বাসনা বিফলে যাইনি। রোমান সভ্যতা যখন মধ্যগগনে বিরাজ করছে তখন আলেক্সজেনড্রিয়ার বৌদ্ধিক বিচ্ছুরণ প্রাচ্যজগতে যথেষ্ট আলোকিত করেছিল। বলা যায় তার দীপ্তি গ্রিসের এথেন্স থেকে কিছু কম নয়। বিশেষ করে আলেক্সজেনড্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কে ঘিরে দর্শন, অঙ্ক, জ্যামিতি জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে যে অসাধারণ বুৎপত্তি লাভ করেছিল, তা এথেন্সের সমতুল্য! হিপসিয়া তারই শ্রেষ্ঠ ফসল এবং বলা যায় শেষ সন্তান। প্রাচীন গ্রিক, ও রোমান সভ্যতার ক্রমাবসান এবং মধ্যযুগের ক্রমউত্থান—অর্থাৎ খ্রিস্টাব্দ পঞ্চম শতাব্দীর এই সন্ধিক্ষণে হিপসিয়ার আবির্ভাব। হিপসিয়া এক অসামান্য নারী। জ্যোতির্বিজ্ঞান, অঙ্ক, ও দর্শনে তার অসামান্য পাণ্ডিত্য এবং ক্লাস নেওয়ার অসাধারণ বাগ্মীতার খ্যাতি আলেক্সজেনড্রিয়া ছাড়িয়ে বহুদুর পৌঁছে গিয়েছিল। অন্য অন্য দেশ থেকে অনেক ছাত্র তার বক্তৃতা শোনার জন্য

আলেক্সজেনড্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড় করত। হিপসিয়ার বাবা, থিয়ন আলেক্সজেনড্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েরও নাম করা অঙ্কের প্রফেসর ছিলেন। আবার আলেক্সজেনড্রিয়ার বিখ্যাত লাইব্রেরির অধিকর্তা ছিলেন। তিনি মেয়েকে নিজের মতো করে মানুষ করেছিলেন। পরবর্তী ক্ষেত্রে দেখা যায়, মেয়ে পিতাকেও ছাড়িয়ে গেছে। হিপসিয়া খুব স্বাধীনচেতা নারী, মনে কোন সংকীর্ণতা ছিল না, আবার কোন ভ্রান্তবিশ্বাসও ছিল না, ধর্ম মানতেন না। সমাজের নানা কুসংস্কার যে, সত্য জ্ঞানের পক্ষে বাধা স্বরূপ সে কথা বলতে দ্বিধা করেননি। এবং সর্বোপরি শিক্ষার আঙিনায় নারী পুরুষের সম অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও সোচ্চার হয়েছিলেন। তাঁর মত ছিল কোন ধর্মীয় পুরোহিত, তার নিজস্ব বিশ্বাসকে, জোর করে আমাদের জীবনে চাপিয়ে দিতে পারে না। অন্ধত্ব নয়, আত্মমর্যাদাকেই স্বীকার করে জীবনের পথকে খুঁজে নিতে হবে। তার এই শুদ্ধ নাগরিক জীবনের পৌরনীতিগুলি আলেক্সজেনড্রিয়ার নগরবাসীদের ভালোরকম সম্ভ্রম আদায় করে নিয়েছিল। তার আরব্ধ কাজের নিষ্পন্নতায় সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, কোন দিক থেকেই যেন কোন বাধা বা বিঘ্ন না ঘটে, সেই জন্য নিজেকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করেননি। অনেক ঐতিহাসিক বলে থাকেন মানব ইতিহাসে তিনিই প্রথম নারীবাদী। একদিকে বৌদ্ধিক স্ফুরণ আর একদিকে জনপ্রিয়তার অভাবনীয় আকস্মিক বিস্ফুরণ —দুই স্ফুরণই উক্ত নারীবাদীর জীবনের কাল হল। সেই সময় উদীয়মান ক্যাথলিক চার্চের বিশপ, সিরিলের বিষ নজরে পড়ল উক্ত নারীবাদী। ঠিক করল, ছক কষে, এই পেগান নারীবাদীকে ইহলোক থেকে সরিয়ে দিতে হবে। সে যে কি নিষ্ঠুর মর্মান্তিক ইতিহাস চোখের জলকে কিছুতেই ধরে রাখা যায় না। একদিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চেরিয়টে (জুড়ি গাড়ি) বাড়ি ফেরার পথে হিপসিয়াকে রাস্তায় কিছু উন্মুক্ত খ্রিস্টানরা ধাওয়া করল, তারপরে তাকে ধরে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হল চার্চে, তারপরে তাকে তলোয়ারের আঘাতে, শত ছিন্ন করে পুড়িয়ে হত্যা করা হল। হিপসিয়ার

জীবনের এখানেই করুণ পরিসমাপ্তি! সেই সঙ্গে ঘোষিত হল, এতদিনের দীপ্তিমান রোমান সভ্যতারও অবলুপ্তি।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে অনেক মনীষীদের কথা পড়েছি, যারা মধ্যযুগে খ্রিস্টান ধর্মযাজক দ্বারা কোথাও হিপসিয়ার মতো নারীর কথা পড়েছেন? কাব্যে উপেক্ষিতার কথাও কিঞ্চিৎ পড়েছি, ইতিহাসের উপেক্ষিতার কথা আমরা কেউ, কখন পড়িনি!'

আমি বললাম, 'জয়, রাফেল কি সত্যিই এই নারীর ছবি এঁকেছেন? কী অসাধারণ !'

জয় আমার কথা শুনেই রেগে গিয়ে বললে, 'কেন মাঝখানে কথা বলিস, শেষ করতে দে, এখানেই আয়েশা দেবীর ভাষণের সমাপ্তি হলে কি হবে, মনে হল আমি যে অনেকক্ষণ ভাষণের অসমাপ্তির মধ্যে রয়ে গেলাম, হিপসিয়ার ঘোরে আমি আলেক্সজেনড্রিয়া শহরের হিপসিয়ার পরিচিত যাতায়াতের রাস্তায় রাস্তায় কী যেন পাগলের মত খুঁজছিলাম, হঠাৎ করতালির আওয়াজে সম্বিৎ ফিরে এল, দেখলাম টাউনহলের মাঝখানে একটা চেয়ারে আমি বসে আছি।'

বুঝলি অভি, আয়েশা দেবীর অসামান্য ভাষণের পর আমি আর ঠিক থাকতে পারছিলাম না, আমি এতটাই বিভোর এবং আচ্ছন্ন ছিলাম! মনে হলো বর্ষার নতুন ধারায়, মৃত ঘাসের মধ্যে উদ্ভিন্ন সবুজ প্রাণের বার্তা যেমন ঘোষিত হয় তেমনি আমার প্রাণের মধ্যে নব জীবনের এক নতুন বার্তার আগমন ঘটল! উঠতে পারছিলাম না, পাশের একজনের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, আয়েশাদি ইন্দুমতি মহিলা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। কী পড়ান বোকার মতো এই প্রশ্নটা করিনি, ভাষণের পর এইটুকু বুঝতে অসুবিধে হবে না কারও, যে উনি সব পড়াতে পারেন!

হল প্রায় ফাঁকা, যে যার মতো বাড়ি চলে গেছে, আমি একা, ভাবছি আয়েশাদির সঙ্গে দেখা করেই যাই, না যাওয়াটা নৈতিকতায়

বাঁধে, অন্তত এইটুকু বলে যাই ‘আপনার পরবর্তী ভাষণের জন্য আমি উৎসুক’! দেখলাম স্টেজের পাশে আয়েশাদি বসে, তাকে ঘিরে কিছু লোকজন, মেয়েদের সংখ্যা বেশি, উপুড় হয়ে কি যেন দেখছে। ভাবলাম গেলে হয়, এই সাতপাঁচ ভাবছি, এমন সময় একটা ছেলে দৌড়ে এসে বললে স্যার, ‘আপনি এসেছেন! একা কেন স্যার? চলুন দিদির সাথে আলাপ করিয়ে দিই’। আমার দ্বিধান্বিত মনকে উড়িয়ে দিয়ে আমাকে প্রায় হাতে ধরে টেনেই নিয়ে গেল। আমি ছেলেটাকে চিনতে পারলাম, আজকে কলেজে ওই কার্ডখানি নিয়ে গেছিল!

কিছুটা বিস্মিত হয়ে বেশ জোরের সঙ্গে জয় বলে উঠল, ‘আরে অভি, তোর চোখে জল!’ আমি বললাম, ‘হিপসিয়ার মৃত্যুটা ঘরের লোকের মৃত্যু বলে মনে হল! তুই আজ কাঁদালি, এ রকম মর্মান্তিক কাহিনি কোনদিন আগে শুনিনি। আচ্ছা জয়, তুই বল এর পর কী হল, তোকে যে টেনে নিয়ে গেল ছেলেটা সেই মহীয়সী নারীর কাছে, তারপর কি বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলি?’

আধো তন্দ্রাছন্ন গোপালদাকে চিৎকারে জাগিয়ে তুলে, জয় বললে, গোপালদা চা জল দুটোই লাগবে, শোন অভি, তুই কিন্তু আরও চোখের জল রাখিস, পরে লাগবে, জগতে নারী জাতির অনেক ট্র্যাজিক কাহিনি কাছে যেগুলো ইতিহাসের পাঠ্য পুস্তকে নেই।’

গোপালদা থতমত খেয়ে, বলতে লাগল, ‘তোমরা দুজনে মিলে কী ঝামেলায় ফেললে বলো তো, শুধু চা আর জল, বাড়ি যাও, নইলে বাড়ির লোকেরা চিন্তা করবে যে!’

আমি বললাম, বাড়িতে বলা আছে গোপালদা, আপনি কেন দুশ্চিন্তা করছেন? আচ্ছা জয়, চোখের জল রাখিস, কি সব বলছিস, আমি বুঝতে পারছি না, আয়েশাদির কথা বল, কিছু কথা হল, নাকি দেবী দর্শন করে চলে এলি!’

আমি অধীর আগ্রহ নিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে আবার বসে পড়লাম।

আয়েশাদির কোন কথা যেন মিস না করি। জয় বলতে শুরু করল।

জাগরণী সমিতির উপ্যাখ্যান—

'আমাকে নিয়ে যাওয়ার সময় আমি ছেলেটাকে কিছু প্রশ্ন করে জেনে য়াই। ছেলেটার নাম ভজন, জাগরণী সমিতির অফিস দেখভাল করে, মাস মাইনেও পায়। সে এতক্ষণ গেটে আগামী কর্মসূচির লিফলেট বিলি করছিল। স্টেজের কাছাকাছি আসতেই ভজন বলে উঠল, 'দিদি! দেখুন স্যারকে নিয়ে এসছি, ওনার কলেজেই সকালে কার্ড দিতে গিয়েছিলাম', কথাটা শুনেই প্রায় সকলেই আমার দিকে তাকাল আমি কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। হঠাৎ উদ্ভূত এক অস্বস্তিকর পরিবেশকে হালকা করার দায়িত্ব আয়েশা দেবী নিজেই নিলেন, বললেন, 'আসুন আসুন, সামনের চেয়ারটায় বসুন'। আমার থলিটাকে চেয়ারের পিছনে ঝুলিয়ে সবে মাত্র বসেছি, উনি আমার দিকে তাকিয়ে সলজ্জ হেসে বলে উঠলেন, 'এক মিনিট, কাজটা করে নিই, ততক্ষণে আপনাকে সমিতির একটা পত্রিকা দিচ্ছি, ঠিক পড়ুন বলব না, একটু দেখুন।' কী বলব অভি, এ রকম সপ্রভিত, মার্জিত মহিলা খুব কম দেখেছি। কৃত্রিমতার লেশমাত্র নেই— মনে হল কতদিনের পরিচিত আমরা। ধন্যবাদ জানানোটা স্বাভাবিক শিষ্টতার মধ্যে পড়ে, কিন্তু এখানে বলাটা যে অভদ্রতার সামিল হবে, সেটা বুঝে আর ও সব কথা না বলে, বললাম, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে আপনি কাজ করে নিন, তারপরে কথা হবে' আয়েশা দেবী স্মিত হাসিতে বুঝিয়ে দিলেন তথাস্তু। আমিও পত্রিকাটা দেখতে শুরু করলাম। পত্রিকার নামটা বড় সুন্দর, 'সময়প্রদীপ'। ভিতরের পাতাগুলো দেখছিলাম। এমন সময় আয়েশা দেবী, বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, দাদা বলুন, ভাষণ কেমন লাগল? দেখেছেন আপনার নামটাই জানা হয়নি— আমার নামটা অবশ্য বলতে হবে না, কার্ডেই ছিল', বলেই হেসে ফেললেন' আমার নামটা বলতে গিয়ে আমার

কিন্তু দাদুর উপর বেশ রাগই হচ্ছিল। মহাভারতের সেকেলে নামটা বলতে একটু সংকোচ হচ্ছিল, অবশ্য দাদু কি আর জানত, নাতিকে কোন একদিন চন্দননগরের টাউন হলে কোন এক সন্ধ্যায়, এক নারীবাদীর সম্মুখীন হতে হবে। যাই হোক, সাহস সঞ্চয় করে বলেই দিলাম, 'ও হ্যাঁ, আমার নাম জনমেজয় রায়, আপনার এ রকম উদ্দীপ্ত ভাষণে আমরা সকলেই মুগ্ধ। হিপসিয়ার কথা সত্যিই তো আমরা জানতাম না। এই নিন পত্রিকাটা,' আয়েশা দেবী বললেন, 'হিপসিয়া বহুকালের একটা অপ্রকাশিত ইতিহাস, শুনেছি হিপসিয়ার চরিত্রের আঙ্গিকে একটা স্প্যানিশ সিনেমা হয়েছে, আমার অবশ্য দেখা হয়নি। পত্রিকাটা ফেরত নেওয়ার জন্য দিইনি জয়বাবু। রাখুন ওটা, রাত্রে পড়বেন। বাঃ, বেশ তো নাম আপনার, পণ্ডিত বংশের ছেলে আপনি, কলেজে কি পড়ান?' আমি বললাম, 'ইংরেজি সাহিত্য।' শুনে প্রায় লাফিয়ে উঠে বললেন, 'বাঃ খুব ভাল হল। শুনুন আপনাকে যদি আমাদের সমিতির সভ্যপদের জন্য যদি অনুরোধ করি, আপনার আপত্তি আছে?' আমি বললাম, 'না তো, আপত্তি থাকবে কেন, যদি যোগ্য মনে করেন! ভালই তো!'

আয়েশা দেবী বললেন, 'দেখুন যোগ্যতা যাচাই-এর কথা বলে আমাদের লজ্জা দেবেন না। সরকারের স্বীকৃতিই যথেষ্ট। প্রফেসর মানুষ, এখানে আপনার সম্মতি একান্ত জরুরি, কোন দোনামনার ব্যাপার নেই, আমরা সভ্যপদের জন্য কোন লিঙ্গ বৈষম্য করি না। নারীবাদী সমিতির সভ্যপদ নিলে আপনি তো আর নারী হয়ে যাচ্ছেন না— আপনার নাম যে রাজারই হোক না কেন সেটা ঠিকই থাকবে!'

আমি বললাম, 'আপনার ভাষণের রেশটা দেখছি এখনও রয়ে গেছে, কি বলছিলেন একটা ফর্ম আনবেন সেটা কোথায়?' এই কথার সঙ্গে সঙ্গে ভজনের ডাক পড়ল। ভজনকে একটা মেম্বারশিপ ফর্ম আনার জন্য বলা হল। কোথা থেকে ভজন দৌড়ে গিয়ে ফর্ম নিয়েও এল! আয়েশা দেবী, হাতে ফর্ম নিয়ে আমাকে বললেন, 'আপনাকে

নিয়ে এত তাড়াতাড়ি করছি কেন জানেন? আমাদের সমিতিতে আপনার মত লোকদের পাই না সেই জন্য। আমাদের একটা ইংরেজি পত্রিকা আছে, মাত্র দুটো ইসু বেরিয়েছে। এডিটিং-এর ভার আপনার উপর ছেড়ে দেব, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনি পারবেন। আমি পেরে উঠছি না। সময় পাই না। বিভিন্ন জায়গায় দৌড়াতে হয়। আপনি ইংরেজি পড়ান শুনে আমি কেন লাফিয়ে উঠেছিলাম সেটা নিশ্চয় এখন বুঝতে পারছেন। বাংলাটা অবশ্য আমি দেখব। আমার অনুরোধ আপনি না করবেন না। ও, হ্যাঁ, ফর্মে, এখানে একটা সই লাগবে, ইমেল ও মোবাইল নাম্বারটা দিন। আমারটা পরে মেসেজ করে দেব। কিছু মনে করবেন না, সমিতির রেজিস্ট্রেশন ফি একশ টাকা। যদি ভাঙানি না থাকে পরে দেবেন কোন অসুবিধে নেই!'

আয়েশাদি গড় গড় করে বলে গেলেন, ওনার বলার মধ্যে এত জোর আছে, কথাগুলো এত স্পষ্ট এবং গলার স্বর এত সুমিষ্ট, কিছু বলার অভিপ্রায় থাকে না— মনে হয় সারাদিন শুনেই যাই। আমি বললাম, 'ঠিক আছে ঠিক আছে, ভজনকে না হয় দিয়ে দেব। দিদি একটু, চা খেলে হতো না!' আয়েশাদি উত্তরে বললে, 'ঠিকই বলেছেন, আমিও ভাবছিলাম। ভজন, যা তো, তরুণের দোকান থেকে সবার জন্য স্পেশাল চা নিয়ে আয়। আচ্ছা আপনি কোনদিকে থাকেন, অটো বা রিক্সা কিছু একটা পেয়ে যাবেন, দেখুন চা খেয়েই উঠে পড়ব, নটা বেজে গেছে, আমার মা আবার চিন্তা করবে।'

ইতিমধ্যে চা চলেও এল। সবাই খেলাম, দারুণ করেছে তরুণ, আমি বললাম, ঠিকই তো, চলুন এবার তালে বেরিয়ে পড়ি। আমি কাছেই পঁচিশ নম্বর ডুপ্লে সরণিতে থাকি, আমারও বেশ ক্লান্তি লাগছে, কালকে কলেজ আছে। দিদি, কাল তো আপনার স্কুল আছে নিশ্চয়!'

টাউন হলের সিঁড়ি দিয়ে আমরা সবাই নামলাম, সংখ্যায় যদিও খুবই কম, রাস্তায় একটা অটো দাঁড়িয়ে আছে। আয়েশাদি বললে,

'আপনি তো বেশ লোক, আমার স্কুলের খবর ও পেয়ে গেছেন দেখছি, আর কী কী পান নি সেটা ভাবছি, অটো দাঁড়িয়ে আছে, যান উঠে পড়ুন।' অটোওয়ালাতো শব্দ করে স্টার্ট দেওয়ার আগে মুখ বাড়িয়ে হেসে বললাম, 'আয়েশাদি, এখনই মিছিমিছি ভাববেন কেন! আপনাকে জানতে আরও অনেক বাকি!'

অটোর ভাড়া মিটিয়ে ঘড়ি দেখলাম প্রায় সাড়ে নটা বাজে। গেট খুলে ঢুকছি, দেখলাম বাড়িওয়ালা বারান্দায় দাঁড়িয়ে। সম্ভবত আমার জন্যই চিন্তা করছিলেন, বললেন, 'কি জয়, কোথায় গিয়েছিল? এতো দেরী তো তুমি করো না!' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, মেশোমশাই, টাউন হলে প্রোগ্রাম ছিল, শুনতে গিয়েছিলাম।' মেশোমশাই বললেন, 'জানি আমি আয়েশার বক্তৃতা, কেমন লাগল?' আমি বললাম, 'আপনি চেনেন, আয়েশা দেবী কে!' 'খুব ভালো করে চিনি, ও তো চন্দননগরের গর্ব, সে গল্প পরে হবে— যাও খেয়ে নাও।'

এরপর সোজা ঘরে ঢুকে পড়লাম। ব্যাগটা বিছানায় রেখে, বাথরুমে হাত মুখ ধুয়ে পাঞ্জাবিটা ছাড়লাম। মাসির তৈরি করা ডিমের ঝোল ভাত, একটু গরম করে খেয়ে নিলাম। তারপর ক্লাস তৈরির পড়াতে মনোনিবেশ করলাম। কিন্তু মন আর বসে না। টেবিলে রাখা মোবাইলের দিকে চোখ চলে যাচ্ছে, দেখছি আয়েশাদির কোনো মেসেজ আসে কিনা! অথচ সেই সময় মেসেজের জন্য প্রত্যাশার কোন দরকারই ছিল না, দরকার থাকার তো কোন কথাও নয়! টাউন হল থেকে এসে আর মন বসাতে পারছি না, পড়াও হচ্ছে না। টাউন হলে আয়েশা দেবীর সাথে দেখা হওয়ার পর থেকে বিদায় অবধি, কথায় এবং আচরণে, মফস্‌সল জীবনের গ্রাম্যতা কতটুকু প্রকাশ পেল, কতটা পেল না, আয়েশা দেবী কি মনে করল, বা করতে পারে, —প্রতিটি সময়ের সংলাপের সমীক্ষা করলাম। যদিও আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বছর কাটিয়েছি, কিন্তু সংকোচ আমার যাইনি। লজ্জা পাওয়ার মত

কোন ঘটনাও পেলাম না। হঠাৎ মোবাইলের ঠুং করে একটা আওয়াজে কিঞ্চিৎ হকচকিয়ে গেলাম। দেখলাম আয়েশা দেবীরই প্রতীক্ষিত মেসেজ এসেছে, খুলে দেখলাম ওনার নাম ও মোবাইল নম্বর আর জাগরণী সমিতির অফিস ঠিকানা। বেশ এইটুকুই! বাড়তি কোন লেখা নেই। খাঁটি ইউটিলেটিরিয়ান! একটু হতাশ হয়ে শুতে গেলাম।

পরদিন কলেজে ক্লাস নিতে নিতে, হঠাৎ ঠুং করে মেসেজের আওয়াজ, সেই সময় দেখিনি, ক্লাস নিয়ে দেখলাম আয়েশা দেবীরই মেসেজে, উনি সমিতির অফিসে ছটায় যেতে বলেছেন। বুঝলাম পত্রিকা নিয়েই হয়ত কথা বলবেন। আমার অনুমান ঠিক। সন্ধ্যে ছ'টায় জাগরণী সমিতির খোঁজ নিয়ে যখন পৌঁছালাম, তখন দেখি আয়েশা দেবী ভিতরে বসে আছেন, আমার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। আসুন জয় বাবু, পত্রিকার জন্য কিছু অফ লাইনে পাওয়া লেখাগুলো আপনাকে দেব বলে বসে আছি, আপনি সময় মতো করে সংশোধন করে ঠিক করে রাখুন, বাকিগুলো ইমেলে পাঠিয়ে দেব, আমি এখনি বেরিয়ে যাব, কিছু মনে করবেন না! একটু ব্যস্ত আছি। ভজনকে বলে যাচ্ছি একটু চায়ের ব্যবস্থা যেন করে। আপনি এখানে বসেও লেখাগুলো দেখতে পারেন, আর একটা ঘরে সমিতির একটা ছোটো লাইব্রেরি আছে, সেটাও দেখতে পারেন!'

কোথায় যাচ্ছেন? কেন যাচ্ছেন? আমাকেও নিয়ে যেতে পারেন, সদ্য এক নব পরিচিতার দৈনিক ডায়েরি, আমার মতো একজন আটপৌরে বাঙালি যুবার কাছে কত অসীম কৌতূহলের বিষয় হতে পারে সে কথা, অভি তোকে কি করে বোঝাই, কিন্তু আধুনিক নাগরিক জীবনে, আচরণবাদের তত্ত্ব আবার ভিন্ন কথা বলে, কৌতূহল থাকাটা যেমন অসভ্যতা, প্রকাশ করাটা নাকি আরও অসভ্যতা! অনেক সময় দেখা যায় মানুষ তার মনের কেন্দ্রাতিগ অস্বাভাবিক বাঁধনকে ছিন্ন করে বেরিয়ে আসে, বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে 'অপকেন্দ্র বল' বলে, আমার

ক্ষেত্রে অবশ্য তা ঘটেনি, তাকে সংযত রেখেই বললাম, 'ঠিক আছে, আপনি যান, কিছু লেখা দেখছি এখানে, রাত্রের মধ্যে শেষ করতে পারলে ফোনে মতামত জানিয়ে দেব।' আয়েশাদি খুশি হয়েই বললেন, 'ভাল কথা আচ্ছা, তালে আসছি', বলে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। ওনার কাজের প্রতি এত ঐকান্তিকতা, এত অনুরক্তি, এত উৎসর্গ, এত সময়নিষ্ঠা, এত আত্মসচেতনতা— কয়েক দিনের পরিচয়ে বুঝতে আমার অসুবিধা হয়নি, আমি ক্রমশ ওনার ভক্ত হয়ে উঠলাম! ইতিমধ্যে ভজন এসে গেল চা নিয়ে, দুজনে বসে খেলাম। কিছু গল্পও হলো, তারপর বললাম লাইটটা জ্বালো, লাইব্রেরিটা দেখব। ভজন নিয়ে গেল আমাকে, ছোটো ঘর, ফেন লাইট, একটা টেবিল, একটা চেয়ার, দুটো আলমারিতে দেখলাম বইয়ে ঠাসা, সব রকমই আছে, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভারতের সংবিধান সহ অনেক আইনের বই। নারীবাদের আলাদা একটা তাকই আছে, স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী থেকে বেগম রোকেয়া, তসলিমা, অরুন্ধতী রায়, আরও অনেক লেখিকার বই আছে। বিদেশী নারীবাদী, মেরী থেকে ভাজনিয়া, মিলের 'সাবজেক্টশন অফ উইমেন!' আমি ও অনেক বই জানিনা, পড়িনি, নিজেকে মূর্খ মনে হল! এই তবে আশ্চর্য হলাম এ রকম একটা জায়গায়, সমিতির ছোট্টো ঘরে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের ভিড়, কারা পড়ে এই সব বই! তবে একজনের বই এখনও মনে আছে 'হৈমবতীর স্মরণিকা। কে এই মহিলা ভাবতেই ভাবতেই দেখলাম, অনেক মহিলা, দিদির খোঁজ করতে করতে সোজা ঢুকে পড়ল, দিদির জায়গায় আমাকে দেখে, একটু হতভম্ব হয়ে গেল, বললে, 'আপনি?' আমাকে সে উত্তর দিতে হল না, ভজনই উদ্ধার করলে। শেষে বললে, 'দিদি কাজে বেরিয়েছে, আজ আর আসবে না।' আমি যে কিছুটা অপ্রস্তুত জায়গায় পড়েছিলাম, সেটা কেটে যাওয়ার পর, আমি পত্রিকার জন্য লেখাগুলো সব নিয়ে আমার ডেরায় ফিরে এলাম। রাত্রে খাওয়াদাওয়া করে বই নিয়ে বসেছি,

পত্রিকার লেখাগুলো পরে দেখব বলে তুলে রেখেছি, এমন সময় আয়েশাদির ফোন, 'হ্যালো, জয় বাবু, আপনাকে ও রকম ভাবে কথা না বলে তখন বেরিয়ে গেছিলাম, অত্যন্ত জরুরি কাজে, যেতে বাধ্য হয়েছিলাম, খারাপ লাগছে, সেই জন্য ফোনটা করছি। এই মাত্র রিষড়া থেকে ফিরলাম, কয়েক জন মিলেই গিয়েছিলাম। আপনি আসার আগেই একজন মহিলা রিষড়া থেকে ফোন করেছিল। সে কথা ফোনে হবে না, সে গল্প পরে হবে, বলুন, লাইব্রেরি কেমন লাগল? বই কিছু আনলেন, না সবই পড়া, ও হ্যাঁ, পত্রিকার জন্য লেখাগুলো আজ রাত্রেই সব দেখে রাখবেন' আমি বললাম, 'লাইব্রেরী দেখে তো লজ্জায় পড়ে গেলাম, অনেক বই বলেছে, এত অজ্ঞতা নিয়ে নিজেকে অধ্যাপক হিসেবে জাহির কর কি করে? কিছু বই দেখে এসেছি, পরে আনব, আগে হেড দিদিমণির অনুজ্ঞা পালন করে নিই', এ কথা শুনে হো হো করে হেসে ফেললেন, 'বেশ বড় সার্টিফিকেট দিলেন দেখছি, খিদে পেয়েছে খাব আমি, মা দেখছি এখনও আমাকে দোষারোপ করে রান্নাঘরে বক বক করে যাচ্ছে', বলছে, 'দুশ্চিন্তা করে, করেই জীবনটাই কেটে গেল!' জানেন, মাকে আপনার কথা বলেছি। বলেছে নিয়ে আসবি। ঠিক আছে রাখছি। মাকে থামাতে হবে' আমি বললাম, 'ঠিক আছে, তবে একটা প্রশ্ন না করে পারছি না আপনাদের ওই লাইব্রেরির পাঠক কারা, আপনি নিজে শুধু?' আয়েশাদি উত্তরে বললেন, 'অনেক আছে জয় বাবু, খাতায় লেখা আছে কে কে বই নিল! আর কারা কারা জমা দিল। আপনার কলেজেরই অনেক ছাত্রছাত্রী নেয়, আপনি আর কতটুকু জানেন?'

সত্যিই তো কতটুকু আর জানি, 'বিপুলা এই পৃথিবী! শুধু পৃথিবী নয়, অবাক হয়েছি তার কর্মকান্ডও'! সম্প্রতি অবশ্য চন্দননগরে অনেক কিছু দেখেছি, কলেজের বরুণদা আমাকে নিয়ে গিয়েছিল, ক্যাথোলিক চার্চ, মিউজিয়াম, পার্ক, ফরাসি ঔপনিবেশিকের ঐতিহাসিক নিদর্শন

দেখে আশ্চর্য হয়েছি ঠিক কথা কিন্তু, সত্যি কথা বলতে কী, চন্দননগরের জাগরণী সমিতির কর্মকাণ্ড দেখে অনেক বেশি বিস্মিত হয়েছি! কেবলি মনে হত, এত বড় রাষ্ট্র, এত বড় সংবিধান, এত অফিস, এত বিভাগ, এত আদালত, এত কমিশন, —তা সত্ত্বেও এই ছোট্ট সমিতির এত কাজ, নারীসমাজের এত সমস্যা, আয়েশাদির এত ছোটাছুটি, আমার চিন্তার অগম্য! নিশ্চয় আছে, হয়ত আমারই অক্ষমতা, সমাজের মধ্যে থেকেও সমাজের একটা উপেক্ষিত, অনাদৃত নারীসমাজের দিকে কোন দিন তাকাইনি, তাকানোর বোধও করিনি, ওদের কোন সমস্যাই আমার জীবনের কোন অধ্যায়ে স্থান পায়নি, জাগরণী সমিতির সংস্পর্শে এসে যেন নতুন ভাবে জাগলাম, আয়েশা দেবীর কর্মোদ্যোগ এবং অঙ্গীকারবদ্ধ আত্মোৎসর্গ, আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। রবীন্দ্রনাথের, 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটা বার বার পড়তে লাগলাম। নারীজাতি তথা মানব জাতির প্রতি এত নিঃস্বার্থ ভালবাসা আমি খুব কম দেখেছি। এতটুকু অহং নেই। বরং, নিজে যেন কোন ভাবেই প্রতিষ্ঠান না হয়ে ওঠে সেই দিকে সজাগ দৃষ্টি। অপরদিকে ইন্দুমতি বালিকা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীদের কাছে একজন অসাধারণ শিক্ষিকা হিসাবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম আছে। আমি যদি ডিকেন্সের মত লেখক হতে পারতাম, তালে 'টেল অফ টু সিটিস' এর জায়গায়, 'টেল ওফ গ্রেট মাইন্ডস' লিখে আয়েশা দেবীকে উৎসর্গ করে জগতে অনেক সুনাম অর্জন করতে পারতাম।

কি বলব, এর পর থেকে আমি ক্রমশই, এই জাগরণী সমিতি, পত্রিকার সম্পাদনা, আয়েশা দেবীর কর্মকাণ্ডের মধ্যে নিজেকে কখন সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত করে ফেললাম, ধরতেই পারিনি। যত দিন যাচ্ছে কর্মব্যস্ততাও উত্তরোত্তর বেড়েই যাচ্ছে। ঘন ঘন সমিতির অফিস হাজিরা, আয়েশা দেবীর সাথে ঘন ঘন মিটিং, অন্য অন্য সদস্যদের সঙ্গে আলাপ, পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা, কখন নারীর অধিকার ভঙ্গের ঘটনাক্রমে জরুরি তলব এবং ঘটনাস্থলে জরুরি গমন, থানা, কোর্ট, উকিল, সব কাজ

করে ফিরে এসে সমিতির অফিসে ক্লান্তিতে ভজনের আনা তরুণের চা —সে এক অনির্বচনীয় অনুভূতি, এক নতুন জগৎ, নতুন যজ্ঞশালা, নতুন জীবন রচনা, জীবনটা যেন নতুনে নতুনে ভরে গেল, সেই সঙ্গে এও বলা যায়, এই প্রথম, মানবিক জীবনের একটা স্বাদ পেলাম। এতদিন আত্মোন্নতির পিছনে ছুটে বেড়িয়েছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলমোহর দেওয়া ভাল রেজাল্টের শংসাপত্রে থলি ভরিয়ে দিয়েছি, তার একটা প্রাথমিক ঘোষণা তো আছেই —সরকারি কলেজের চাকরি! মনে আছে, এক সময়, ড্রয়িংরুমের সান্ধ্য অতিথিদের কাছে, আমার সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষৎ গড়ে তোলা নিয়েই ছিল মুখ্য আলোচনার বিষয় অর্থাৎ কোথায় যাবে, কী পড়বে, কী চাকরি ইত্যাদি ইত্যাদি —এগুলো এখন ভেবে আমার মাথাটা হেঁট হয়ে যাচ্ছে। দারিদ্র্যের কথা বাদ দিলেও, নারীর মর্যাদাহানির কী যে করুণ, কী যে মর্মভেদী পরিণতি —সেই সব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমাকে দিনভর ভাবিয়ে তুলল! আমি এক উচ্চ বংশীয় অমুক চন্দ্রের ছেলে, স্বনামধন্য ওমুক বাবুর নাতি, ভাল সরকারি বেতনে বেশ ভাল খাওয়া দাওয়া করে যে আয়েস করে জীবন কাটাচ্ছি, সেটা ভেবেও এক অপরাধ বোধের যন্ত্রণা কুরে কুরে খাচ্ছে! তথাকথিত সভ্য নাগরিক জীবনের প্রতি এতটাই অশ্রদ্ধা বেড়ে গেল, মনে হল সমিতির ঘরে মাদুর পেতে শুয়ে থাকাটা একমাত্র পাথেয়।

একদিন বিকেল বেলা, টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে, সম্ভবত শনিবার, সমিতির ঘরে বসে বই দেখছিলাম, আরও দুই তিন জন ছিল, ভজনও দরজার কাছে মোড়ায় বসে বৃষ্টি দেখছিল। এমন সময় আয়েশা দেবী, কিছুটা ভিজে, কিছুটা না ভিজে, হন হন করে ঘরে ঢুকলেন, ছাতাটা ঘরের কোনায় রেখেই বললেন, কখন এলেন? ভালই হল, কী ভজন চা হবে নাকি, তোর নতুন স্যারের জন্য আলুর চপ, কী বলিস! আচ্ছা, জয় বাবু আপনি কি কোনদিন চন্দননগরের তালশাঁসের সন্দেশ খেয়েছেন?

বোধহয় খাননি, ঠিক আছে একদিন খাওয়াব।' ভজন চা আনার নাম করে, বেরিয়ে গেল। বাকি উপস্থিত জনেরা বললে, দিদি আমরাও খাব।' আয়েশাদি বললে, নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, 'আচ্ছা, আপনার অফ ডে কবে?' আমি বললাম, 'অফ ডে কথাটা আপনি জানেন! আমার সোমবার!' 'আরে জয় বাবু, আপনি কলেজে পড়ান ঠিক কথা কিন্তু আমি ও তো কলেজ পাশ, একটু হেসে নিয়ে বললেন, 'সোমবার অফ ডে, ভাল কথা, শ্রীরামপুর কোর্টে যেতে হবে, কেস আছে, সোমবার ডেট পড়েছে শুনানির, আমিও যাব, সঙ্গে সমিতির একজন উকিলও থাকবে, সমীরণবাবু আলাপ করিয়ে দেব— ভীষণ ভাল লোক।' আমি বললাম, 'কিসের কেস?' আয়েশাদি বললেন, 'আরে একদিন বলছিলাম না, রিষড়া থেকে ফিরছি, একজন অল্পবয়সি বিধবা, জামালপুর থেকে এসেছে, ছেলেকে শুধু দেখতে নয় ছেলে কে নিয়ে থাকতে। স্বামীর মৃত্যুর পর ছেলেকে ওর সঙ্গে দেশে যেতে দেয়নি। তারপর থেকে ছেলেটা ওর শ্বশুরবাড়িতেই আছে। ছেলেটাই কারোর সাহায্যে ফোনটোন করেছিল মাকে আসার জন্য, সমস্যা হচ্ছে বিধবা মহিলাকে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আর ঢুকতে দিচ্ছে না, আমাকে তাই ফোন করেছিল, আমি জানি, বিশেষত বিবাহিত মহিলা বা বিধবাদের বাসস্থানের অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না, কোর্ট থেকে সেই রায় আনতে হয়, আপাতত ঠিক করেছে ছেলেকে নিয়ে সে থাকবে, মানুষ করবে, তাতেই শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের এতো রাগ! কী অদ্ভুত ব্যাপার! বিধবার বৈধব্য জীবন নিয়ে কারো দুঃখ নেই, বরং বিধবা হওয়ার কারণ যে বিধবা নিজেই, শ্বশুরবাড়ির এ কলঙ্ক লেপন তাকে সারা জীবন বহন করতে হবে! অথচ সকলেই জানে মটর বাইকের রোড অ্যাক্সিডেন্টে ওর স্বামী মারা গেছে। দুঃখিনী বিধবাটির কী করুণ এবং কঠিন পরিস্থিতি, চিন্তা করে দেখুন। আমার সঙ্গে এল না, বললে বারান্দা কিংবা রাস্তার ফুটপাতে থাকব এখান থেকে নড়ব না। আচ্ছা

জয়বাবু, আপনার কি মত? নারীজীবন মানে কী? কতগুলো রোমহর্ষক লাঞ্ছিত জীবনের কাহিনি যা নিত্য প্রকাশিত হয় খবর কাগজের সচিত্র প্রতিবেদনে, পরে সেগুলোর নির্বাণ প্রাপ্তি ঘটে মুদির দোকানের ঠোঙাতে! কি তাইতো? নামি মরমী লেখকের ব্যথিত হৃদয়ের কতগুলো অশ্রুসিক্ত বই-এর পাতা যা বাজারে খুব চড়া দামে বিকোয়! কী আছে তার? অথচ জীবনভোর দেখে আসছি পুরাণের দেবদেবীর মধ্যে নারীশক্তির কত কথা, সেতো মিথ্যা আস্ফালন ছাড়া কিছু নয়! আমরা সে কথা আর কবে বুঝব?'

ইতিমধ্যে ভজনের নিয়ে আসা গরম চা গরম চপ সবাই মিলে খাচ্ছি, আয়েশা দেবী, বললেন, 'আপনার উত্তর এখনও পাইনি, জয়বাবু!' আমি একটু থতমত খেয়েই বললাম, 'প্রশ্ন একাধিক, তবে মতামত চাওয়ার কোন যৌক্তিকতা সম্ভবত নেই আয়েশা দেবী, আপনার কথার ভিন্ন মত নিয়ে আমি বসে আছি, সেটা কি করে জানলেন, অকাট্য সত্য কথাই বলেছেন, আমার কয়েক মাসের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞতা আপনার প্রতিটি কথাকেই স্বীকার করে!' একটু ভয়ে ভয়েই ছিলাম, কী মনে করবেন কে জানে, সত্যি কথা বলতে কী, আমি একটু এড়িয়েই যাচ্ছিলাম। আয়েশা দেবী বললেন, 'তালে এবার ওঠা যাক, স্কুল থেকে দুটোর পর বেরিয়ে অনেক জায়গায় গেছি, ক্লান্তিও আছে, তবে জয়বাবু আপনার কথা শুনলে 'ম্যান ইন ব্ল্যাকের' কথা খুব মনে পড়ে! 'আমি বললাম, ' ম্যান ইন ব্ল্যাক' সে আবার কে? আয়েশাদি বললে, গোল্ডস্মিথের 'ম্যান ইন ব্ল্যাক', পড়েছেন নিশ্চয়, মনে পড়ছে না হয়তো! আমি বললাম, না পড়িনি, গোল্ডস্মিথের নাম কে না জানে, নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ পড়েছি, এই পিসটা কোথায় পেলেন?' এ কথা শুনেই বললেন, দাঁড়ান, আমি তালে বইটা নিয়ে আসছি। লাইব্রেরির আলমারি থেকে একটা বই নিয়ে এলেন, অনেক পুরোনো, সম্ভবত কলেজ স্ট্রিট থেকেই কেনা, হলুদ মলাটটা এখনও লেগে

আছে। বইটার নাম সিটিজেন অফ ডি ওয়র্ল্ড, আয়েশাদি বললেন, 'দেখুন বইটা আমার বাবার কেনা এবং পড়া, পেন্সিলের দাগ দেওয়া পিসটাই ম্যান ইন ব্ল্যাক, বাবারও প্রিয় ছিল, পরে আমারও যে খুব প্রিয় বলা বাহুল্য। আপনারা যে কয়জন আছেন, মাদুরটা পেতে বসুন, আমি ক্লাস নেওয়ার মতো করেই পড়াব, যদিও ক্লাসটা জয়বাবুরই নেওয়ার কথা ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাকেই নিতে হচ্ছে, ইতিহাসের ছাত্রী আমি, ইংরেজীর দিদিমণি নই, দেখা যাক। শুরু করছি। মাঝখানে কোনো প্রশ্ন করবেন না।' আমরা সবাই মুগ্ধনয়নে অপার বিস্ময় নিয়ে ম্যান ইন ব্ল্যাক এর অপূর্ব বর্ণময় চারত্রিক চিত্রের বর্ণনা শুনতে লাগলাম। লন্ডন শহরে বন্ধুকে নিয়ে প্রাক সন্ধ্যাকালে পথ ভ্রমণের অপূর্ব দৃশ্য যেন দেখতে পাচ্ছিলাম, ম্যান ইন ব্ল্যাকের প্রতিটা পৃষ্ঠার প্রতিটা লাইন অসাধারণ বাংলায় ব্যাখ্যা করে যাচ্ছিলেন। মনে হল আমাদের মনের সাদা পৃষ্ঠায় কে যেন ছবি এঁকে এঁকে যাচ্ছে! ভালো মানুষ যে কতদূর পর্যন্ত ভালো হতে পারে সে রকম কোনো ধারণা আমাদের ছিল না, তার মানবিক চরিত্রের আর একটা দিক লেখক অদ্ভুত ফুটিয়ে তুলেছেন, দুঃখী মানুষের জন্য তার হৃদয় ফেটে যাচ্ছে, অথচ সেটা যেন বাহ্য জগতে প্রকাশ না পায়।

'সে বড় মর্মস্পর্শী ঘটনা। ম্যান ইন ব্ল্যাককে হঠাৎ করে দেখলে তার চারিত্রিক অসঙ্গতি যেমন আমাদের বিস্মিত করে, আবার কখন ঘটনার নিরিখে একটা বড় মনের পরিচয় রেখে যায় যা আমাদেরকে অভিভূত করে। পুরোনো, প্রাচীন লন্ডন শহরের, এক পুরোনো রাস্তা, ফ্লিট স্ট্রিট ধরে বন্ধুর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ কোনো বৃদ্ধ, অনুগ্রহ প্রার্থী, পথ ভিখারীর সম্মুখবর্তী হলে যেমন তার মনকে ভীষণভাবে বিচলিত করে। তেমনি ভিখারীর স্ব কথিত করুণ কাহিনি তার হৃদয়কে কিভাবে বিদীর্ণ করত তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এইরূপ করুণ দৃশ্য দেখে, কি করবে সে ভেবে পায় না। সে তৎক্ষণাৎ, কিছু না শুনেই

পকেটের কয়েক শিলিং মুদ্রা, বন্ধু ক্ষণিকের অন্যমনস্কতায়, ভিক্ষুকের বাড়ানো উল্টানো শতচ্ছিন্ন পশমের টুপিতে সযত্নে নিক্ষেপ করেই, বেশ জোরের সঙ্গে বন্ধুকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে শুরু করে, আর বল না! এইসব ভিক্ষুকদের উপদ্রুতে লন্ডন শহরে আর হাঁটা যায় না।

এইসব অলস ব্যক্তিদের জন্য আইন করে কিছু একটা বিহিত করা উচিত। এসব ভেগাবন্ডদের জেলখানা হচ্ছে উপযুক্ত স্থান। ঠিকই বলেছ বলে বন্ধুটি সায় দেয়, তার কারণ সে আরও শুনসেত চায় ম্যান ইন ব্ল্যাকের কথা। ম্যান ইন ব্ল্যাকের চারিত্রিক অসঙ্গতি ও মানবিক হৃদয়ের পরিচয় দার্শনিক বন্ধুটি অনেকদিন আগেই পেয়েছিল।

আবার কখন পথপ্রান্তে শীতের সন্ধ্যায় জ্বালানি কাঠ নিয়ে বসে থাকা গরিব বিক্রেতাকে দেখে তার খুব কষ্ট হয়, বিক্রেতাকে কোনো দাম বলার সুযোগ না নিয়ে বাজার দরের দ্বিগুণ দামে, জ্বালানি কাঠের আটিগুলে সব কিনে কাঁধের উপর ঝুলিয়ে বিজয় গর্বে হাঁটতে হাঁটতে, বন্ধুটিকে বলতে লাগল, ভাবা যায়? কত সস্তায় পেয়ে গেলাম! নিশ্চয় কাঠ গুদাম এথকে চুরি করা মাল, নইলে এত সস্তায় এ ব্যাটা বেচে কী করে? উক্ত ঘটনাদ্বয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা জানতে পারি, ম্যান ইন ব্ল্যাক, ভাষার সুনিপুণ চিত্র অঙ্কনে মানবিক চরিত্রের এক উদ্ভুত নিদর্শন। সাধারণ মানুষের দুঃখ দারিদ্র তাকে বড্ড পীড় দেয়। সাধ্য মতো দুঃখ মোচনের চেষ্টাও করে, সে জানে তার চেষ্টা খুবই অপ্রতুল, প্রয়োজেনর তুলনায় কিছুই নয়, তাতেই তার মানবিক হৃদয়ের যন্ত্রণায় খুব কষ্ট পায়। দৈনন্দিন জীবনে শুধু দয়া, করুণা দিয়ে সে সবার দুঃখ দূর করতে পারে না। তার থেকেই উদ্ভুত এক অপরাধবোধকে, লজ্জার সাথে সে ঢেকে রাখতে চায়। সে যে ভালো মানুষ, সেটা সে সমাজকে জানাতে চায় না। সে লজ্জাবোধ করে। কি করে বোঝাই আপনাদের, আমি নিজেই সব বুঝে উঠতে পারিনি! কি অসামান্য চরিত্র। কি অসামান্য লেখকের কলমের জোর।

একদিকে আধুনিক সভ্যতার নাগরিক মনের সংকীর্ণতা, অপর দিকে ম্যান ইন ব্ল্যাকের হৃদয়ের প্রসারতা—সেটা তুলে ধরাই লেখকের মূল উদ্দেশ্য, ছকেবাঁধা পারিবারিক গন্ডির মধ্যে তার হৃদয় আবদ্ধ নয়, তার হৃদয় পড়ে আছে বিশ্বলোকে, তার কোন সীমা পরিসীমা নেই, দরিদ্র মানুষ দেখলেই তার হৃদয়ের ব্যথা উথলে উঠে, এ রকম ভাল লোক তো জগতে খুব কম, ভাগ্যক্রমে আমরা জয়বাবুকে সে রকম পেয়েছি' বলে হেসে দিলেন। চলুন বাড়ি ফেরা যাক, বৃষ্টি আর নেই, ক্লান্তিও চলে গেছে।' আমি বললাম, আয়েশাদি, আপনার ক্লাস করার পর এখন মনে হচ্ছে কোন দিন যেন ইংরেজি সাহিত্যের ক্লাসই করিনি, আজকেই যেন প্রথম করলাম। নিধুবাবু ঠিক বলেছেন, 'বিনে স্বদেশি ভাষা, মেটে না আশা' অপূর্ব লাগল! 'আমার কথায় সকলেই সায় দিল, হ্যাঁ দিদি ঠিকই, খুব ভালো।' এর পর সভা ভঙ্গ হল, যে যার মতো সবাই ঘরে ফিরে গেল। কিন্তু ম্যান ইন ব্ল্যাক এর সেই সন্ধ্যাটা কোন দিন আর মন থেকে মুছে গেল না।

এদিকে জাগরণী সমিতি ও আয়েশা দেবীর নাম শুধু হুগলি জেলার মধ্যে আর থাকল না, বঙ্গের অনেক জেলাতেই আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ল, খবরে কাগজে সাক্ষাৎকার নিল, যদিও আয়েশাদি এগুলো একদম পছন্দ করতেন না, তাঁর কাজের গতিও বেড়ে গেল এবং বিচিত্রগামী হয়ে উঠল। কখন থানা, কখনও কোর্ট, কখন ও আবার ডি.এম. অফিস। একা নয় সমিতির অনেকেই থাকেন, আমিও মাঝে মাঝে থাকি। এর মধ্যে আয়েশাদির বাড়িও কয়েকবার গেছি। মাসিমা না খাইয়ে ছাড়েননি। আয়েশাদির বাবা অনেক আগেই ইহলোক ছেড়ে চলে গেছেন— এ খবর আমার জানা ছিল। মাসিমাও খুব ভাল মানুষ, হাসি দেখলে মনে হয় রাগ কি জিনিস উনি জানেন না। সব সময় দেখি ব্যস্ত, কিছু না কিছু কাজ করছেন, নিজের জন্য নয়, পরের জন্য। পরের আনন্দেই নিজের আনন্দ —এই হচ্ছে মাসিমার ধর্ম। দুঃখ

একটা ছিল। স্বামীকে হারিয়েছেন অনেক কাল আগে, কিন্তু সে কথা কাউকে বলতেন না!

প্রায় সাড়ে দশটা বাজে, শনিবার। রাত্রের খাওয়াদাওয়া করে সবে মাত্র বসেছি, কী করব ঠিক করিনি, এমন সময় মোবাইলে ফোন এল, 'হ্যালো, আমি আয়েশাদি বলছি'। আমি বললাম, 'ও! আপা বলুন বলুন', আচমকা এই আপ্যায়নে আয়েশাদি এমন হেসে ফেললেন, বুঝলাম হাসির চোটে মোবাইলটা মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, তুলে বললে, 'কি ব্যাপার, আমার মুসলমানি নামের জন্য কি আপা ডাকলেন? তাই না!' আমি বললাম, 'না না, তো ঠিক নয়, আপা কথাটা কি বাঙালি শব্দ নয়? আমার তা ভীষণ ভাল লাগে, আপা নামে বাড়তি সুবিধাও আছে, আলাদা করে— দিদি, দেবী যুক্ত করতে হবে না।' আয়েশাদি বললেন, 'সরি, ওরকম ভাবে আমার বলাটা ঠিক হয়নি, ঠিক আছে, আমিও তালে ভাইয়া বলে ডাকব, তালে আমাকেও বাবু, দাদা আর যুক্ত করতে হবে না।' আমি বললাম, 'বাঃ, বাঃ, সুন্দর! ঠিক আছে, চলবে।' আয়েশাদি বললেন, 'আচ্ছা শুনুন, কাল রবিবার, দুপুরে চলে আসুন, কলেজ তো নেই, মোচার ঘন্ট হচ্ছে, আপনার ভালো মাসিমার আবদার আপনাকে খাওয়াবে। একটু তাড়াতাড়ি আসবেন— সমিতির কাজের ব্যাপারে কিছু কথা আছে বলে নেব, তালে রাখি এখন?' 'বাঃ বেশ সুখবর দিলেন, ঠিক আছে, দেখা হবে, রাখুন,' বলে আমি ও রেখে দিলাম।

সত্যি! মাসিমা খুব ভালো রাঁধেন, প্রথম বার যখন গিয়েছিলাম মুড়িঘন্ট, মুগের ডালে, অসাধারণ। মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে গেছিল, আপনারা কি বাঙাল? ওনার উত্তরটাও বেশ সুন্দর ছিল, 'না না, আমরা খাটি বাঙালি, আদি নিবাস, হুগলি জেলার রাধাবল্লভপুর গ্রাম।' প্রথম যেদিন গিয়েছিলাম, মাসিমাই দরজা খুললেন, বললেন, 'এসো বাবা, বসো, বসো, তিশা এদিকে আয় তো মা, দেখ তোদের জয়বাবু

এসেছেন। তিশা আমার মেয়ের ডাক নাম বাবা, তুমি হয়তো জানো না', আমি বললাম, 'অবাক লাগছে, মাসিমা আপনি আমাকে চিনলেন কি করে?' একটা গ্রুপ ফটোতে তিশা তোমার ছবি দেখিয়েছিল বাবা, লম্বা ফরসা সুন্দর চেহারা, সে কি ভুলতে পারি?' বলে একটু মৃদু হাসলেন। আমার কাছে খুব বিস্মিত লাগে মাসিমার এত স্নেহ, এত মায়া, কোথা থেকে পান, কথার সঙ্গে যেন ঝরে ঝরে পরে! অপর দিকে পুরুষদেরকে দেখে মনে হয় মফস্‌সল থানার বড়বাবু, সব সময় যেন ধমক দিচ্ছে!

রবিবার সকালে তাড়াতাড়ি উঠে টিফিন খেয়ে বই নিয়ে বসে পড়লাম। মন লাগল না, সমিতির ত্রৈবার্ষিক ইংরেজী পত্রিকার লেখাগুলো ফাইনাল করে আজকে ভাবছি আয়েশাদিকে জমা দিয়ে দেব, পত্রিকার নামটা জেনেছি, 'ডায়াটিমা', এও এক গ্রিক রমণীর নাম, আয়েশাদি একবার বলেছিলেন এই রমণীর গল্প একদিন শোনাবেন। ভাবছি আজকে একটা সুযোগ পাওয়া গেছে, শোনা যাবে। তাড়াতাড়ি স্নান করে, পায়জামা পাঞ্জাবি পরে, একটা থলি নিয়ে সাড়ে দশটা নাগাদ বেরিয়ে গেলাম। আসন্ন গুরুভোজের কথা মনে রেখে কিছু মিষ্টি পান ও সাদা পান নিয়ে, গণ্ডলপাড়ার আয়েশা দেবীর বাড়ির অভিমুখে যাত্রা শুরু করলাম। অটো করে যাওয়াতে বিশেষ সময় লাগল না, বেল বাজতেই, মাসিমা নয়, আয়েশা দেবী দরজা খুললেন, হয়তো আমার অপেক্ষায় ছিলেন। আমি বললাম, 'আরে, তিশাদি কেমন আছেন? সকালে বাজার করেছেন তো!' উত্তরে বললেন, 'বাঃ বাঃ, ম্যান ইন ব্ল্যাকের তো দেখছি ভালই কথা ফুটেছে, আসুন আসুন আপনার অপেক্ষায় আছি, এত টাকার বাজার যেন বৃথা না যায়!' মাসিমা একটু উচ্চস্বরে বললেন, 'কে তিশা, জয় নাকি? না মা, ম্যান ইন ব্ল্যাক, কি যে বলিস বুঝতে পারি না।' 'হ্যাঁ মাসিমা', আমি জয় বলছি। মাসিমা বললেন, 'ঠিক আছে বাবা, তোমরা দুজনে বস, আমি

চা নিয়ে আসছি।'। আমি ইতিমধ্যে, পানগুলো আয়েশাদিকে দিয়ে বললাম, রাখুন, আর পত্রিকার লেখাগুলো দিয়ে বললাম, আপনি একটু দেখে নেবেন।' উনি বললেন, 'পান এনেছেন, বাঃ, অনেকদিন খাইনি, লেখাগুলো এনেছেন দেখছি, এখন আলমারিতে রাখছি'। এই ঘরেই দেওয়ালে ঠেস দেওয়া একটা বই এর আলমারিতে রাখলেন। বিপরীত দিকের সোফাতেই বসে আছি, আলমারির পাশের দেওয়ালে দেখলাম বাঁধানো ফ্রেমে সাদা কালোয় একটা পুরুষ মানুষের ছবি, আগে কেন চোখে পড়েনি তা বুঝলাম না। খুব সুন্দর, বেশি বয়স নয়, ভালো মানুষের চেহারা! আমি বললাম, 'ইনি কে, কার ছবি?' আয়েশাদি বললেন, 'বাবার ছবি', আবি বললাম, 'বাবা দেখছি আপনার থেকেও ভাল লোক।' কী করে বুঝলেন? ছবি বলছে আমি নই। যেমন পিতা, তেমন কন্যা। কথাটা লাইক ফাদার লাইক সন বলে 'কিন্তু লাইক ডটার হলেও ভুল ছিল না। আপনি তো একবার বলেছিলেন বাবার কথা কিছুই জানেন না, শুধু বলেছিলেন আপনার নামটা বাবার দেওয়া।' আয়েশাদি বললেন, 'কথাটা ঠিকই, আচ্ছা জয়বাবু, বাবাকে নিয়ে একটা স্মরণ সভা করলে কেমন হয় বলুন তো। আমি বাবাকে ভীষণ ভালোবাসি। আমার নামটা রেখেছে, কিন্তু কোনোদিন তো ডাক শুনিনি —এটা যে কী ভীষণ কষ্ট দেয় আপনাকে বোঝানো যাবে না, এমনকি পৃথিবীর কাউকে নয়। জানেন, আমার তো জীবনে, বাবা! বাবা! বলে কোনোদিন তো ডাকা ও হয়নি। বাবার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়া কিংবা আদর খাওয়া—এ সব তো কোনোদিন কিছু জীবনে ঘটেনি, জীবনের এত বড় অপূর্ণতা কী দিয়ে ঢাকব? কী আছে আমার সান্ত্বনা, জয়দা বলতে পারেন? আজ থেকে আপনাকে আর বাবু বলে ডাকব না, দাদা বলেই সম্বোধন করব। আমার যখন খুব অল্প বয়স, মাঝে মাঝে বাবার অফিসের কলিগ বন্ধুরা আমাদের বাড়ি আসত, দেখে যেত, মা মেয়ে কেমন আছি, আমাকে আদর করে বলত, পরেশবাবুর মেয়ে কী সুন্দর,

বড় লক্ষ্মী মেয়ে, বাবার মতো ভালো মেয়ে। আমি জিজ্ঞাসা করতাম, বাবা কোথায়? ওরা বলতেন, বাবা! বাবা! তোমার বুকের মধ্যে, বুঝতাম না।' আর একটু বড় হয়ে স্কুলে ভর্তি হলাম। চন্দননগরে একটা কো-এড্ স্কুল আছে ওখানেই পড়তাম। মা ইচ্ছে করেই কো-এড্ স্কুলে দিয়েছিল, সবার সঙ্গে মিশুক, জানুক, মেয়েকে শুধু নারী করে তোলাটাই উদ্দেশ্য ছিল না। দেখবেন আমি কেমন সবার কাছেই স্বাভাবিক— এর জন্য মায়ের কাছে ঋণী। মা'ই পড়াত, পড়াশুনায় ভালই ছিলাম— রেজাল্ট ভালোই হতো। মা আমার হয়ে উঠল ফ্রেন্ড, ফিলোসফার, গাইড। সাধারণত এই পদ বাবারাই পায়, কিন্তু আমি তো বাবাকে পাইনি ওই ফটোটা ছাড়া, বাবা শব্দটায় আমি চিরকাল বোবা হয়ে রইলাম!' আয়েশাদির কথা শুনে এত কষ্ট হচ্ছিল, কী উত্তর দেব ভেবে পাচ্ছিলাম না। এর মধ্যে মাসিমা চা নিয়ে এলেন, মাসিমা বললেন, 'তিশা কি সব অপূর্ণতার কথা বলছিলি রে? বুঝতে পারি না!' আয়েশাদি বললে, 'শোন মা, তোমাকে অনেকদিন ধরেই বলেছি বাবাকে নিয়ে একটা স্মরণ সভা করব। জয়দাকেও বলেছি। তুমি দেখছি গা করছ না? মাসিমা বললেন, ঠিক আছে বাবা, তোরা কর আমি তো আপত্তি করছি না, স্মরণ করার আগে বাবাকে তো জানতে হবে, তারপর তো স্মরণ। ঠিক আছে, একটু দাঁড়া, গ্যাসটা বন্ধ করে আসি, তারপর তোর বাবার কথা বলছি।' আমি আর আয়েশাদি একটা বড় লম্বা সোফায় অধীর আগ্রহ নিয়ে বসলাম। সামনের কুশন দেওয়া বেতের চেয়ারটা রাখা হল মাসিমার জন্য। আয়েশাদির বাইরের ঘরটা বেশ চমৎকার। বসলে উঠতে ইচ্ছে করে না। অনেক জানলা আছে, আবার গঙ্গার ধারেই। বেশ হাওয়া আছে আবার আলোও আছে। সেই আলো হাওয়া যুক্ত স্নিগ্ধ ঘরে মাসিমা, ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন।

হৈমবতীর স্মৃতিচারণ :—

'বিয়ের আগে আমার নাম ছিল হৈমবতী চক্রবর্তী, বিয়ে পর

স্বাভাবিক ভাবেই চ্যাটার্জ্জি হয়, স্বামীর নাম ছিল পরেশ চ্যাটার্জ্জি। আমি যখন থার্ড ইয়ারে পড়ি তখনই আমার বিয়ে ঠিক হয়, যদিও তখন আমার বিয়ে করার ইচ্ছে ছিল না। বাবার অকস্মাৎ মৃত্যু আমার বিয়েকে ত্বরান্বিত করেছে, মামা একদিন বাড়িতে এসে মাকে বললে, 'শোন স্বাতীর জন্য ভালো এক পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে, ছেলের বাড়ি এই তারকেশ্বরে, হুগলি শহরে সরকারি চাকরি করে, ভূমি সংস্কার বিভাগে, খুব ভালো ছেলে।' মা আর না করেনি।

স্বাতী আমার ডাক নাম। বিয়ের ব্যাপারে আমার মত ছিল ভিন্ন। বিশেষত কলেজে পড়ুয়া নারীদের জীবনে প্রাক বিবাহকালে দুটো স্বপ্ন থাকে, পড়াশুনাটা যেন থেমে না থাকে আর একটা চাকরি। বেশির ভাগ নারীদের ক্ষেত্রে অপূর্ণ থেকে যায়, আমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল, তবে বিয়ের পর আর সে খেদ ছিল না, অপূর্ব সঙ্গীলাভে আমি সব কিছু ভুলে গেলাম। এতদিন আগের ঘটনা তবু মনে হয় যেন সেদিনের কথা! হুগলি নগরের কার্পাস ডাঙা, তথা রবীন্দ্রনগরে দু কামরার ছোট্ট ঘরে 'নতুন সংসার' পাতার বিচিত্র আনন্দের কথা কী আর বলি, আমার মনে হয় কোন বিবাহিত নারীই যেমন ভুলতে পারে না, আমিও ভুলিনি। শুধু বেঁচে থাকাটাই জীবন নয়, মানুষই একমাত্র জীব সে বললে একটু ভালো করে বাঁচব, আমাদের যুগলের প্রতিদিনের জীবনপঞ্জীতে সে কথাই যেন লেখা আছে। বড় জিনিস বাদই দিলাম, ছোটোখাটো বলতে নতুন পর্দা, পাপোশ, ক্যালেন্ডার থেকে রান্নাঘরের শিলনোড়া পর্যন্ত কত নতুন জিনিস ঘর যেমন ভরে যায় ঠিক তেমনি মনও ভরে যায়। কেনাকাটা নিয়ে আমাদের মধ্যে কোনদিন কোন বিবাদ বা মনোমালিন্য হয়নি, দুজনেই দুজনের পছন্দ মতো জিনিস কিনতাম, খেতাম, ঘুরতাম, কিন্তু কোনোদিন ঝগড়া হয়নি, আমরা পরস্পরকে সমমর্যাদা জ্ঞানে স্বীকার করে দুজন দুজনকে ততদূর পর্যন্ত মানতাম, যতক্ষণ না সাংসারিক সুখ ও পূর্ণতার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি।

মনে হয় মানব সভ্যতার এটাও একটা বড় দিক। আমি একটু বাড়তি কথায় চলে যাচ্ছি, তিশার বাবার স্মরণসভার কথা যখন উঠেছে, তখন স্বামীকে নিয়ে বলটাই শ্রেয়।

আমি যে সময়ের কথা বলছি সেই সময় ইন্টারনেট, মোবাইলের যুগ এসে পৌঁছায়নি, আবার এটিএম কার্ডের প্রচলনও শুরু হয়নি, টিভি কেনাও ছিল সাধ্যের বাইরে। ত্রিশ বত্রিশ বছর আগেকার কথা, নবনির্মিত সাংসারিক জীবনের ভূমিকা রচনা হতে না হতেই, আমার স্বামী চলে গেলেন। পাঁচ ছয় বছরের স্মৃতি আমার বাকি জীবনের অমূল্য পাথেয় হয়ে আছে সে কথাই আজ বলব।

আমার স্বামী খুব বই ভালবাসতেন, দেদার বই কিনতেন, পড়তেন, পড়াতেন, কখনও উপহারও দিতেন, হৈমবতীর স্মরণিকা বইটা আমাকে প্রথম বিবাহবার্ষিকীতে উপহার দিয়েছিলেন। আমার নামে বঙ্গদেশে এ রকম কোনো লেখিকা আছে আমি সত্যিই জানতাম না, আসলে বইটা হল আত্মজীবনী, হৈমবতী সেনের, অল্পবয়সে বৈধব্য জীবনের আত্মকথন। কী অসহ্য অবমাননা, দুঃখ, যন্ত্রণা, কত প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে লড়াই করে দাঁড়িয়েছিলেন, সে ভাবা যায় না। বইটি আমি সবাইকে পড়তে বলি। সমিতির লাইব্রেরিকে দান করেছি। তিশা বলে, এই বইটা পড়ে নাকি প্রথম অনুপ্রাণিত হয়েছিল! অবাক লাগে, বইটা পড়েই আমার নিজের নামের প্রতি ভালোবাসা জন্মে, আগে আমার মনে সায় দিত না, হৈমবতী নামটা একটু পৌরাণিক গোছের, বেশ বড়, উচ্চারণও অসুবিধা হত, শুনেছি কোন এক স্কুলের মাস্টারমশাই নামটা দিয়েছিলেন— এখন মনে হচ্ছে আমি তাঁর কাছে ঋণী। আমার মতে, এই বইটা বলা যায় বঙ্গদেশে নারীবাদের প্রথম ‘বর্ণ পরিচয়’।

বিবাহিত জীবনে, প্রথম পাঁচ বছরের মাথায় আনন্দঘন যুগলের সংসারে হঠাৎ বড় রকমের ছন্দপতন ঘটল, তখনও তিশা আসেনি, আমার স্বামী প্রায়ই অসুস্থ হতেন, জ্বর আসত একটা কাশিও ছিল।

আমি ভাবতাম, ইনফ্লুয়েঞ্জা, কিংবা ঠান্ডা লেগেছে। একদিন হঠাৎ মুখ দিয়ে রক্ত বেরল তখন আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। হুগলি জেলা হসপিটালে নিয়ে গেলাম, এক্স রে এবং স্কিন টেস্ট করে জানা গেল টিবি হয়েছে। ডাক্তার ওষুধ দিয়ে দিলেন এবং বললেন বেশ কিছুদিন খেয়ে যেতে হবে, সময় লাগবে ওনার আলাদা থাকার ব্যবস্থা করবেন, এখন কিছুদিন এক ঘরে না শোয়াই ভাল, রোগটা একটু ছোঁয়াচে। অফিস থেকে বলে দিল, এখন আর পরেশবাবুকে আসতে হবে না, মেডিক্যাল লিভ পেয়ে যাবেন। আমাকে তখন এক হাতে সব কিছু করতে হত, হাট বাজার, দোকান, স্বামীর ওষুধ! স্বামীকে এক রেখে যেতেও ভয় করত। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন কমলাকে পেয়ে গেলাম, কার আশীর্বাদ কে জানে! সে এসে একদিন বললে, 'দিদি আমি কাজ খুঁজছি, সামনের দোকানে খবর পেলাম, দাদাবাবু অসুস্থ তাই দৌড়ে এলাম'। কমলাও দুঃখী মহিলা, একটা ছেলে আছে, স্বামী ওকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। সম্ভবত আর একটা বিয়ে করেই পালিয়েছে, কমলা অনেক খোঁজাখুজি করেও সন্ধান পায়নি। এ রকম ঘটনা বাংলায়, বিশেষ করে কুলিকামিন ঘরে আকছার ঘটে আমি জানি, কিন্তু কমলার মতো এত ভালো মেয়ের জীবনে ঘটল—তাতে আমি খুব দুঃখ পেলাম এবং বিস্মিতও হলাম এই ভেবে কমলাকে বোঝেনি এ রকম পুরুষ জন্মাল কী করে? সেই থেকে কমলা আমাদের বাড়িতে। ছেলেকে বোনের কাছে রেখে এসেছে। তার ছেলের নামই ভজন, সমিতির অফিস এখন দেখভাল করে। তিশাই ওকে রেখেছে। কমলাকে পেয়ে বেশ নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, মনে হল স্বামীর দীর্ঘদিনের সেবাশুশ্রূষা নিজ হাতেই করতে পারব, আমার স্বামীও নব নিযুক্তার সংবাদে খুব খুশিই হলেন। আমার স্বামী যে খুব বই ভালোবাসতেন সে কথা আগেই বলেছি, ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের বই পড়তেন, আর পুরোনো দিনের সেই মারফি রেডিওতে আকাশবাণী থেকে প্রচারিত আধুনিক গানের

আসর, বেতার নাটক, সন্ধ্যায় ইভা নাগের সংবাদ, এমনকি দুপুরের বরুণ মজুমদারের গ্রামীণ সংবাদও বাদ যেত না। মেডিক্যাল লিভে ছিলেন, তাই অফিস ছিল না, সারাটা দিন বই পড়ে আর গান শুনে অতিবাহিত করতেন। আমি কমলা এক ঘরেই থাকতাম, আমার স্বামী পাশের ঘরে থাকত, খারাপ লাগত, উপায় ছিল না, ছোঁয়াচে রোগ বলে সাবধানতা মেনেই চলতাম। ডাক্তার একটা ডায়েট চার্ট করে দিয়েছিলেন, একজন করণিকের সীমিত আয়ের মধ্যে যতটুকু করার সাধ্য ছিল ততটুকুই করছিলাম, এই ব্যাপারে কার্পণ্য, শৈথিল্য বা উপেক্ষার নাম গন্ধ ছিল না। মাঝে কিছুটা ইম্প্রুভ করেছিল, তবে সেটা কয়েকদিনের জন্য, দেখা গেল আবার জ্বর, কাশি ও রক্তবমি হতে লাগল। আবার হসপিটালে ডাক্তারের সাথে কথা বললাম, ডাক্তার বললেন, এক কাজ করেন আপনি ওনাকে শ্রীরামপুর টিবি হসপিটালে নিয়ে যান। আমি লিখে দিচ্ছি। ভর্তি করে দেবেন, মনিটরিং দরকার, অবসারভেশনে রাখলে, দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন।' আমি পরের দিন পাড়ারই একটা ছেলেকে নিয়ে শ্রীরামপুর যাই, টিবি হসপিটালে স্বামীকে ভর্তি করে দিই। গত দুই তিন মাস ধরে ঘরে রেখে, চিকিৎসা করেও যখন উন্নতি বিশেষ হল না তখন আমাদের দুজনের মনটা বেশ ভেঙে গিয়েছিল। শ্রীরামপুরের হসপিটালের ডাক্তার বললেন, 'মন ভাঙলে চলবে না, মনের জোর রাখাটাও অত্যন্ত জরুরি, চিকিৎসাশাস্ত্রও সে কথা বলে। এ সব রোগ থেকে সুস্থ হতে সময় লাগে, ধৈর্য রাখতে হবে। আগামী সপ্তাহে এক্সরে করে আপনাকে বলব। এখন যা ওষুধ লিখি দিচ্ছি তাই চলবে, আপনি মাঝে মাঝে মাংসের স্টু করে খাওয়াবেন।' আমি জিগ্যেস করলাম। 'পরের সপ্তাহে কখন দেখা করব ডাক্তারবাবু।' ডাক্তার বললেন, 'বিকালে, রাউন্ড দেওয়ার পর। পাঁচটার সময়।' আমি ঠিক আছে বলে বেরিয়ে গেলাম।

প্রতিদিন দশটা পঞ্চাশের লোকাল, হুগলি স্টেশনের এক নম্বর

প্লাটফর্মে ধরি। তারপর শ্রীরামপুর যাই, মাঝে মাঝে কমলাকেও নিয়ে যাই, তার কারণ, অনেক সময় ফিরতে রাত হয়, ভয় করে। যাতায়াতের অভ্যাস যেমন কোনো কালেই ছিল না, এখন আবার দৈনিক যাতায়াতের অতি অভ্যাসে নিত্যযাত্রীর তকমা পেতে বেশি দেরি হল না। আমার আবার রবিবার ছিল না, প্রতিদিনই মনে হত যেন সোমবারের তাড়া! মেয়াদ শেষের আগে ঠিক ঠিক সময়ে মান্থলিও কেটে নিতাম। প্রতিদিনের যাতায়াতের পথে চেনা পরিচিতির সংখ্যা খুবই কম, প্রায় নেই বললেই চলে। স্টেশনে, ট্রেনে, চারপাশে এত ভিড়, তবু মনে হত বড়ো নিঃসঙ্গ, বড়ো একাকী। সত্যি বলতে কী যাতায়াতের পথে কোনদিনই বন্ধুবান্ধবের বিশেষ সন্ধান পাইনি, একদিনই পেয়েছিলাম ঠিকই, আবার পেতাম না বলে যে দুঃখে কাতর ছিলাম, তাও নয়। আসলে, আমি তো সে রকম চাকুরিজীবীদের মতো নিত্যযাত্রী ছিলাম না, বলা যেতে পারে সাময়িক কালের, স্বামীর অসুস্থতায় একজন প্রক্ষিপ্ত যাত্রী মাত্র, হঠাৎ করে নিত্যযাত্রীদের দলে ঢুকে পড়েছি। একদিন সন্ধ্যের ব্যান্ডেল লোকালে বাড়ি ফিরছি, লেডিজ কম্পার্টমেন্টের পিছনের সিটে খোলা জানলার ধারে বসে আছি। ছুটে চলা অন্ধকারের অদৃশ্যপটে, উদাস মনে তাকিয়ে ছিলাম মাত্র, ভাববার অবকাশও নেই, অবচেতন মনে হয়তো এই প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছিল, জীবনটা কি অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে, নাকি কবিরা ভাষায় 'ঘোলা জলের ডোবা'? এমন সময় আমার কাঁধে ছোঁয়া দিয়ে কে যেন বলে উঠল, 'আরে স্বাতী না'! আমি বললাম, 'আরে বিশাখা, বস বস', আমার পাশেই ওকে বসালাম। বিশাখা আমার কলেজের বন্ধু, স্বাতী নামেই আমাকে ডাকত। বিশাখা বললে, 'বিয়ের পর আর দেখাই হয়নি। তোর হঠাৎ করে বিয়ে হওয়াতে আমাদের ক্লাসের মধ্যে একটা শূন্যতা দেখা দিয়েছিল, —ভালো ছাত্রী ছিলিস, সুন্দর গল্প করতিস, ক্লাসটাকে ভরিয়ে রাখতিস। এখন দেখছি তোর মুখে একটা বিষণ্ণতার ছাপ, বিয়ে তো বেশিদিন হয়নি, কি হয়েছ তোর?' বিয়ের প্রারম্ভিক

জীবনের অধ্যায় থেকে শুরু করে সেদিনের পর্যন্ত আমি সব খুলে বললাম। বিশাখাও বেশ মন দিয়ে শুনল। তারপর বললাম, 'ঠিক আছে বিশাখা, আমার কথা শুনে আর কী হবে! তোর কথা বল'। বিশাখা বললে, 'সত্যি স্বাতী, মানুষের জীবনে এত অনিশ্চয়তা ভাবা যায় না, দুঃখ করিস না, স্বামী সুস্থ হয়ে যাবে, আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবি। মেয়েদের জীবনটা লড়াই-এ ভরা। এই দেখ না আজই একটা স্কুলের চাকরির ইন্টারভিউ দিয়ে এলাম, জানি না হবে কি না। আমিও একটা লড়াইয়ে আছি স্বাতী। এম.এ.বিএড করে চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছি। তুই তো জানিস শেওড়াফুলিতে আমরা ভাড়া বাড়িতে থাকি, বাবার আয় খুবই কম, ভাইগুলো বেকার, চাকরি ছাড়া উপায় নেই, মনে আছে তুই আমাকে খেপিয়ে, মৃণাল সেনের এক দিন প্রতিদিনের দিদি বলে ডাকতিস। মনে হয় স্বাতী আমার জীবনটা সেই দিকেই যাচ্ছি। ঠিক আছে তোর ঠিকানাটা দে তো', বলে একটা কাগজের চিরকুটে লিখে নিয়ে বললে, 'তোর বাড়ি একদিন শীঘ্রই যাব।' আমি বললাম, 'পরের স্টেশনে নেমে যাব, বেশি সময় নেই বিশাখা, আমিও তোর মতো লড়াই চেয়েছিলাম রে! জানিস তো, সংসার ধর্মেরও একটা লড়াই আছে, তার মূল কথা হলো পালন করো, আর তোর লড়াইয়ের মূল কথা হলো জয় করো। নারী জীবনে কোনটা শ্রেয় বিশাখা? এই দেখ! স্টেশন এসে গেছে, আচ্ছা নামছি, আসিস একদিন।' সেই একদিন যে কত বহুদিন পার হয়ে গেছে, তার হিসাব কে রাখে! ওর ঠিকানাটা না নেওয়াতে মস্ত বড়ো ভুল হয়ে গেছে। যোগযোগ আর কোনদিনই হয়নি, কোথায় আছে এখনও জানি না। শুনেছি ও একবার চুঁচুড়ার রবীন্দ্রনগরে আমাদের পুরান বাসায় গিয়েছিল। চন্দননগরের ঠিকানা আর জানতে পারেনি, তাই উভয়ের মধ্যে ডাকযোগে পত্রবিনিময়ের শেষ অবলম্বনটুকুও আমাদের মধ্যে আর ছিল না।

যখনই হসপিটালে যেতাম দীর্ঘক্ষণ আমার স্বামীর কাছেই থাকতাম।

যত্নসহকারে দুপুরে খাওয়াতাম, খবর কাগজ নিয়ে যেতাম, গল্প করতাম, শ্বশুরবাড়ি, বাপের বাড়ির লোকদের খবরাখবর দিতাম, কে আসবে বলেছে, কাকে বারণ করেছি আসতে, ইত্যাদি ইত্যাদি। নীরবে শুনত সে সব কথা, কষ্ট পেতাম যখন দেখতাম, স্বামীর সেই একই আক্ষেপ, একই বিলাপ, 'বেশি দিন তো আর বাঁচব না, তোমার কী হবে স্বাতী? অল্প ফ্যামিলি পেনসন! চালাতে পারবে তো! সারাটা জীবন পড়ে আছে।' আমি বলতাম, 'এই সব অলক্ষুনে কথা বলছ কেন? টিবি রোগে কেউ মরে নাকি? খুব শীঘ্রই রবীন্দ্রনগরে চলে যাবে। অফিসে জয়েন করবে, আমি ডাক্তারের সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা বলছি। দেখো, তোমার এই নেতিয়ে পড়া কথাগুলো শুনতে ভালো লাগে না, অসহ্য! মনে একটু সাহস সঞ্চয় করো।' আবার বড়ো অদ্ভুত লাগে যখন দেখি, এত অসুস্থতার মধ্যেও নিজের কথা নয়, স্ত্রীর মঙ্গলের কথা ভেবে যাচ্ছে। সংসারে স্বামীকে বাদ দিলে স্ত্রীর যে কোনো সংজ্ঞা থাকে না, এ কথা কী করে বোঝাই তাকে! নিজেকে নয়, শুধু অপরকে ভালবাসার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা এই রূপ চিন্তা যে মানুষের হতে পারে তা আমার স্বপ্নেরও বাইরে! আমার স্বামী যে কী ভীষণ ভালো মানুষ ছিলেন ভাবা যায় না —এ কথা চিৎকার করে বলতে আমার দ্বিধা নেই। হসপিটালের বেডে শুয়ে আছে, মুখখানা করে আছে যেন, কত বড়ো অপরাধী, বলতে চাইছে, আমার জন্য তোমরা এত কষ্ট পাবে কেন? এ রোগ তো আমিই বাঁধিয়েছি, তার ফলভোগ আমি একাই করব, তোমরা নও। এ রকম লোকের সান্নিধ্য পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার, তিশার জন্য দুঃখ হয়, কিছু বইপত্র আর ছবি ছাড়া, বাবার সঙ্গলাভ বলে তো ওর জীবনে তো কিছু ঘটেনি। অফিসের লোকেরা বলাবলি করত, পরেশবাবুর মতো লোক হয় না!'

একদিন ডাক্তার এক নার্স কে দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি ও তাড়াতাড়ি গেলাম। ডাক্তার বললেন, 'আরে বসুন, বসুন।

দেখুন আপনার স্বামীর এক্সরে রিপোর্ট। প্লেটগুলো সবই দেখলাম, খুব একটা ইমপ্রুভ করেনি, লাঙসের অবস্থাও ভালো নেই, কতগুলো ইঞ্জেকশন আনতে হবে, আজকের রাত্রের মধ্যে জমা করে যাবেন, একটু দাম হবে, আমি ইঞ্জেকশনগুলো লিখে দিলাম।' ভাবলাম ডাক্তারের প্রেসক্রিপসন নিয়ে ওর কাছে দেখা করতে এলাম। সেই সঙ্গে এই খেয়ালও হল, আমাকে এখনই বাড়ি যেতে হবে আমার কাছে টাকা নেই, টাকা এনে ওষুধ কিনে জমা দিয়ে যাব, বেশি সময় নষ্ট করা যাবে না। আমি ওকে বললাম, 'শোনা, তুমি এখন কাগজটা পড়, আমি কতগুলো ওষুধ কিনে আনছি।' আমাকে দেখেই ও বললে, 'ডাক্তার কী বললে, আর দেরী নেই নিশ্চয়, ঘণ্টা বাজছে নাকি?' আমি বললাম, 'কিসের ঘণ্টা? ও বললে,কেন, চার্চে যে বাজে মৃত্যুর ঘণ্টা!' আমি বললাম, আজেবাজে কথা বলো না, ভালো লাগে না!' বলে তড়িঘড়ি করে রওয়ানা দিলাম, ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে পাঁচটা বাজে, টিপ টিপ করে আবার বৃষ্টিও পড়ছে, হুগলি স্টেশনে যখন নামলাম, সন্ধ্যে সাতটা। অটোওয়ালাকে বললাম, ভাই রবীন্দ্রনগরের মোড় দিয়ে না গিয়ে আমাকে বক্সীদের বাগানে নামিয়ে দিও। যদিও নামেই বাগান আসলে সেটা ছিল বড়ো বড়ো শাল গাছের ঘন জঙ্গল। ভাবলাম বক্সীদের জঙ্গলটা দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে গেলে অনেকটা শর্ট কাট হয়। এ ছাড়া মোড়ে খুব জ্যামও থাকে। সে দিন একাই ছিলাম, কমলাকে নিয়ে যায়নি, শ্বশুরবাড়ি থেকে কার যেন আসার কথা ছিল সেই হিসাবে বাড়িতে কেউ থাকাটা অত্যন্ত জরুরি। তখনও বৃষ্টি পড়ছে, জঙ্গলটা বেশ অন্ধকার, ছাতা বন্ধ করেই হনহন করে হাঁটছি, বেশ ভয়ও করছে। মাঝামাঝি জায়গায় এসেছি, এমন সময় দুটো তিনটে শক্ত জোয়ান ছেলে পিছন দিক থেকে আমাকে জাপটে ধরে। আমি বেশ হকচকিয়ে যাই, বুঝতে পারিনি, বলি, 'আমাকে ছেড়ে দাও, আমার স্বামী বড়ো অসুস্থ, এখনি হসপিটাল যেতে হবে।' তারপর মুখে

একটা কাপড় শক্ত করে বেঁধে, কিছু একটা স্প্রে করে। এক ধাক্কায় ভেজা ঘাসের মাটিতে ফেলে দেয়, ব্যাগটা দূরে ছিটকে পড়ে, আমিও সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলি, পরে জ্ঞান আসলে, আসতে আসতে উঠি, বুঝলাম কেউ কোথাও নেই, হাতঘড়িটা খুঁজে পেলাম না, কিছুটা দূরে অন্ধকারে ক্ষীণ পদসঞ্চারে পায়ে কী যেন ঠেকল, হাত দিয়ে বুঝতে পারলাম আমারই ব্যাগ। কর্দমাক্ত শতছিন্ন ব্লাউজ শাড়ি পরে, কোনোমতে আব্রুটা দিয়ে, টিপ টিপ বৃষ্টির মধ্যে, আলো আঁধারি নির্জন পথে, ক্লান্ত দেহে বাড়ির পিছনের গেটে এসে টোকা মারলাম। 'কমলা' বলে, ডেকে বললাম, 'দরজা খোল'। কমলা আমাকে দেখে আঁতকে উঠল, 'একি বউদি, কাদা, শাড়িছেঁড়া, এগুলো কি করে হল?' আমি বললাম, 'শোন এখনি আমাকে বেরোতে হবে, প্রশ্ন করে সময় নষ্ট করিস না। আর বলিস না, কী বিপত্তি! কী বলব তোকে, ট্রেন থেকে তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে, দরজার হুকে লেগে শাড়িটা এফোঁড় ওফোঁড় ছিঁড়ে যায়, আবার তাড়াতাড়ি আসব বলে বক্সীদের জঙ্গল দিয়ে আসতে গিয়ে অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে কাদায় পড়ে যাই! শোন একটু খাবার রেডি কর, আমি স্নান করে আসছি। খেয়ে আবার বেরিয়ে যেতে হবে। তোর দাদাবাবুর ওষুধ কিনে আজকেই দিয়ে আসতে হবে। অবস্থা ভালো না কমলা। আমার কাছে অত টাকা ছিল না, টাকার জন্যই বাড়ি এসেছি, যা এবার খাবারটা তৈরি কর। তুইও রেডি হয়ে নে, আমার সঙ্গে যাবি।' সেই রাত্রে আবার ওষুধ কিনে হসপিটালের নার্সের হাতে দিয়ে এলাম, ব্যাগটা খোয়া যায়নি বলে, ডাক্তারের প্রেসক্রিপসনটা ব্যাগেই পাওয়া গেল। নার্সদের বললাম, 'প্লিজ, ঘুম ভাঙলেই, স্বামীকে বলে দেবেন, আমরা এসেছিলাম। ওষুধ দিয়ে গেলাম। ঘুমিয়ে থাকার জন্য আর ডাকিনি— চিন্তা যেন না করে।' কমলাকে নিয়ে যখন বাড়ি ফিরলাম, দেওয়াল ঘড়িতে দেখলাম এগারোটা পনেরো, এত রাত কোনো দিন হয়নি, আবার এ রকম বিভীষিকা রাত আমার জীবনে

কোনোদিন আসেনি।

কমলাকে কিছু না বলেই শুতে গেলাম, নিজের দেহটার পরে একরাশ ঘৃণা নিয়েই শুতে গেলাম, কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না, দেহে কোণ দাগ নেই ঠিক কথা, কিন্তু মনে একটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল, তার জ্বালায় কষ্ট পাচ্ছিলাম। থানা পুলিশ করে সশস্ত্র শক্তির আহ্বানে নারীর মর্যাদা রক্ষা করার থেকে স্বামীকে বাঁচানই আমার কাছে বড়ো মিশন, বড়ো চ্যালেঞ্জ ছিল। ভাবলাম এতকাল যা পূজা করেছি সবই নারী শক্তিকে নিয়ে, কিন্তু রাস্তাঘাটে আমরা যে এত অসহায়, অবলা আগে কোনদিন চিন্তাও করিনি। সমাজের কাছে আমরা কী বস্তু? সত্যি, বস্তুই তো! সেটা কী? ঠাহর করতে পারলাম না, ফিমেলই রয়ে গেলাম এখনও হিউম্যান হয়ে উঠতে পারিনি! অবেচেতন মনে ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম আমি জানি না।

ঘুম থেকে উঠেই, হসপিটালে যাওয়ার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠল, নতুন ওষুধে কেমন কাজ দিল কতটা সুস্থ হয়ে উঠল, এটা জানার জন্য মন খুব উতলা হয়ে উঠল! কমলাকে বললাম, 'আজকে একটু তাড়াতাড়ি যাব, ভাবছি ফার্স্ট রাউন্ডে ডাক্তার যখন আসেন তখনই দেখা করব, চটপট রান্নাটা কর, আর দাদাবাবুর জন্য টেংরির জুসটা করে দে, আমি স্নানে যাচ্ছি।' দশটা পঞ্চাশের অনেক আগের লোকালে শ্রীরামপুর চলে গেলাম। ডাক্তার বললেন, 'নতুন ইঞ্জেকশনে জ্বরটা কমেছে, মনে হয় কাজ দেবে, দেখা যাক! তারপর বেডের কাছে গিয়ে বললাম, 'কিগো, কখন উঠলে? কাল রাত্রে তুমি ঘুমচ্ছিলে বলে আর ডাকিনি। এই নাও কাগজটা পড়। এখন কেমন বোধ করছ? ডাক্তার তো বললে জ্বরটা কমেছে— ইঞ্জেকশনে কাজ দিয়েছে, টেংরির জুসটা এনেছি খেয়ে নাও।' আমাকে এত তাড়াতাড়ি আসতে দেখে কিছুটা বিস্মিত হয়ে বললে, 'কালকে এত রাত হল কী করে? তোমার জন্য অনেকক্ষণ জেগে, অপেক্ষা করে করে শেষে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

তুমি এত সকালে কী করে এলে? রাত্রে কি এখানে ছিলে নাকি? জান! ইঞ্জেকশনটা দেওয়ার পর ভালই সুস্থ বোধ করছি, ভাল লাগছে।' কথাটা শুনে এত আনন্দ পেলাম, কী বলব! জীবনে যত বিপদই আসুক আমি সব কিছু নীরবে মাথা পেতে নেব, বললাম, 'না না, রাত্রে থাকার কোনো প্রশ্নই নেই, এখানে সে রকম থাকার ব্যবস্থা নেই, তুমি আগে স্টুটা খাও, পরে বলছি।' তারপর আমি আমার গত রাত্রের ঘটনা সব খুলে বললাম। স্বামীকে তো কোনদিন কোন কথা গোপন করিনি। ভীষণ সংকোচ হচ্ছিল, লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছিল, কান্নাও পাচ্ছিল। ভীষণ কষ্ট করে চেপে ছিলাম, হসপিটাল বেড়ে কান্নাকাটি করা বড়ো অশোভন, দৃষ্টিকটু এবং অনেকের কাছে অহেতুক কৌতূহলের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াবে, আমার কান্না যেন ফল্গু নদীর মতো আমার অন্তরে নিঃশব্দে প্রবাহমান!

মুখের মধ্যে কোন উদ্বেগ বা আতঙ্ক না রেখেই ঘটনার সব বৃত্তান্ত শুনে, অত্যন্ত সহজ করেই, স্বামী বললে, 'এ ঘটনা কাকে কাকে বলেছ? থানা পুলিশ করেছ নাকি? আমি বললাম 'না, কাউকে না, তুমি আর আমি ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ জানে না'। ও বললে, 'কেন দুষ্কৃতকারীরা!' তা অবশ্য জানে, তবে সম্ভবত অন্ধকারে কেও কাউকে চিনতে পারিনি।' এই কথা শুনে বললে, 'ঠিক আছে'। এই নিয়ে চিন্তা করো না। আমি যাই, তারপর দেখব, তোমার উপর দিয়ে খুব ধকল গেছে বুঝতে পারছি, খারাপ লাগছে। দোহাই তোমার, তুমি আর ওই ধর্ষিতা কথাটা বার বার উচ্চারণ করো না, একদম পছন্দ করি না, সতী-অসতী, শুচি-অশুচি —এ গুলো সব পুরুষজাতির তৈরি করা কথা। মনে রেখো এ সব কথা আমার অভিধানে নেই। মনই হচ্ছে সমস্ত শক্তির আধার, শক্ত করো, ভেঙে পড়ো না। মনে রেখো, 'স্ট্রেংথ ইজ লাইফ'। দেখবে কোনও দূষণই মনকে দূষিত করতে পারে না। আজকে কেন যেন মনে হচ্ছে, আমি খুব সুস্থ। আমি বললাম,

‘ভীষণ ভাল লাগল তোমার কথা শুনে, নিজেকে বড়ো মুক্ত মনে হচ্ছে, ঠিক আছে তুমি এবার একটু বিশ্রাম নাও।’

সামনে উপবিষ্ট দুই বাক্‌হীন শ্রোতাদের দিকে হঠাৎ চোখ পড়াতে, দেখি, দুজনেই পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে আছে। মেয়েকে বলি, তিশা মা শুনছিস বাবার কথা, তিশা চোখে জল নিয়ে কান্নার স্বরে বললে, ‘হ্যাঁ মা, বলো!’ ছাব্বিশ বছরে এই প্রথম শুনছি।’ তিশার কথা শুনে আমি বলি, ‘ঠিক আছে মা শোন শেষটা অল্প বাকি আছে!’

‘ইতিমধ্যে এক মাস ধরে যাতায়াত হয়ে গেছে, দ্বিতীয় বারের জন্য মান্থলি টিকিটও কেটেছি, স্বামী কখন একটু ভালো— কখন আবার বাড়াবাড়ি। জ্বরটাও পুরোপুরি সারছে না, অল্প হলে ও লেগে আছে, দেড় মাস হয়ে গেল। ডাক্তারকে খুলে বললাম। ডাক্তার বললে, ‘এই ধরনের টিবি সারতে সময় লাগে, টেম্পারেচার রিডিংটা খুব গুরুত্বপূর্ণ’। আমি বললাম, এর মধ্যে একদিন রক্তও বেরিয়েছে, আবার কাশিটাও আছে। কী হবে ডাক্তার বাবু?’ ডাক্তার বলছিলেন, ‘এই রোগ অনেক সময় কিডনি লাংস—দুটোকেই ক্ষতি করে, দেখি আরও কিছুদিন’, বলে চলে গেল। কী করব সামান্য আয়ে বড়ো জায়গায় কী করে নিয়ে যাই, জমানো টাকা কিছু নেই, বিয়ের আগে যে টাকা জমিয়েছিল আমার স্বামী, দেশের বাড়িতে ঘর করে খরচ করে দিয়েছে। যাকেই জিজ্ঞাসা করি, কি করব সেই বলে ডাক্তার যা বলে তাই শুনবেন! অথচ এখানের ডাক্তার যা বলে তাতে তো আমার স্বামীর ভালো হওয়ার লক্ষণ তো কিছু দেখছি না, বরং খারাপই দেখছি, ওজন মারাত্মক কমে গেছে, বড্ড রুগ্নও লাগছে। অন্য অন্য পেশেন্ট পার্টির লোকেরা অনেকে বলছে, ‘দিদি, দাদাকে এখান থেকে নিয়ে যান, শুনেছি এখানে চিকিৎসা ভালো নয়।’ প্রাইভেট নার্সিং হোমে যে নিয়ে যাব সে টাকা কই? ভাসুর একদিন এসেছিলেন, দেখে চলেও গেছেন, বাপের বাড়ির কেউ নেই, টাকা দিয়ে সাহায্য করবে, ভাইটাও চাকরি পায়নি। এ রকম

চুপচাপ বসে থাকতে দেখে স্বামী জিগ্যেস করল, 'কিগো, কী অত ভাবছ বলত, ওই রাত্রের কথা না আমাকে নিয়ে?' আমি বললাম, না না কোনটাই নয়, আমি কিছু টাকার কথা ভাবছি।' ও বললে, 'দেখো আমি কিন্তু এখান ছেড়ে কোথাও যাব না, মরি আর বাঁচি, এখানেই থাকব, আমি ভালো আছি। যাও রাত্রি হয়ে যাচ্ছে, কমলা তো একা আছে বাড়িতে!' আমি 'হুঁ' বলে বেরিয়ে গেলাম। শ্রীরামপুর স্টেশনে বাড়ি ফেরার ট্রেনও পেয়ে গেলাম। নিত্যনৈমিত্তিক যাতায়াতের পথে, কী করব, কী করা উচিত, কী করলে ভালো—এ রকম, অন্তর বিদীর্ণ, বিবিধ প্রশ্নে আমি দগ্ধ। আবার কোনরূপ উত্তর না থাকায় মানসিক যন্ত্রণায় আমি বিদ্ধ। কিন্তু আরও বড়ো মানসিক যন্ত্রণা যে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল, সেটা আগে ভাবিনি, সে কথা বলি।

একদিন, সকাল দশটায় স্নানে গেছি, বাথরুমে ঢুকতেই মাথাটা ঘুরে গেল, বমিও পেলো, হল না। কমলাকে ডাকলাম। 'কী হল বৌদি'! বলে দৌড়ে এল, আমাকে তুলে কমলা বলল, 'চলো চলো, বিছানায় শোবে চলো, মনে হয় অম্বল হয়েছে। কালকে রাত্রে এঁচোড় খাওয়াটা ঠিক হয়নি।' আমি বললাম, 'ঠিক আছি, বালতিতে জলটা ভর, আমাকে বেরোতে হবে', আমি পরিষ্কার অনুভব করলাম, আমার দেহে নতুন কোন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে, স্নান করে, অল্প খেয়ে উদভ্রান্তের মতো বেরিয়ে গেলাম। ক্লিনিক, ওষুধের দোকান করে, ক্লান্ত দেহে, অবসন্ন মনে, যখন হসপিটাল পৌঁছালাম, দেখলাম বেশ দেরি হয়ে গেছে— পাঁচটা বেজে গেছে, রাউন্ড দিয়ে ডাক্তার চলেও গেছেন। আমি স্বামীর কাছে দ্রুত গিয়ে জিগ্যেস করলাম, 'দুপুরে ঠিক মত খেয়েছ? আমি ঠিক, সময় মত আসতে পারিনি বলে, চিন্তা করেছ নিশ্চয়!' শুনে স্বামী বললে, 'শুধু চিন্তা তো নয়, দুশ্চিন্তাও! আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।' আমি বললাম, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে আমার, একথা পৃথিবীর কাউকে বলা যাবে না, খুব কম হতভাগ্য নারীর

কপালে এ রকম ঘটনা ঘটে! শোনো, আমাকে এখনি অ্যাবোরশন করতে হবে, তুমি মনে করো না আন্দাজে বলছি, সব টেস্ট করেই বলছি, এ পাপ রাখা যাবে না।' পাপ কথাটা শুনে ও এত জোরে হেসেছিল, মেল ওয়ার্ডের সমস্ত লোক আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল— মনে হল এ রকম হাস্যকর কথা ও যেন জীবনে প্রথম শুনল। সেই হাসির আওয়াজ এখন ও আমার কানে লেগে আছে, তারপর ও বললে, 'কী সব পাগলের মতো বলছ, 'পাপ পুণ্য' বলে কোনো কথা আমাকে বলো না, এটাও মানুষের তৈরি করা কথা— স্রেফ ঠকাবার জন্য, এগুলোও আমার অভিধানে নেই। যে আসছে, স্বাতী, তাকে আসতে দাও, তার তো কোনো দোষ নেই, জগতের অনেক অপ্রত্যাশিত, মনুষ্যজীবনে আশীর্বাদ, কী করে বোঝাই তোমাকে। আমি হয়তো থাকব না স্বাতী। দেখা যাবে ও হয়তো তোমার সব থেকে বড়ো সঙ্গী হবে, এমনকি সমাজেরও! তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, আমি হয়তো কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলাম। ব্যাপারটা এতই অসম্ভব আমি তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিনি। তোমার চেহারার মধ্যে একটা দীপ্তি ফুটে উঠেছে, চেহারাই জানান দিচ্ছে নতুন কিছু সত্তার আবির্ভাব, তুমি বুঝতে পারনি, নিজেকে তো নিজে, কেউ দেখতে পারে না।'

তখন আমি মানসিক ভাবে ভীষণ বিধ্বস্ত ছিলাম, বলা যায় দিশেহারা অবস্থা, স্বামীর সব কথা শুনিনি, কিছু শুনেছি, কিছু বাদ গেছে, আমার নিজের মধ্যেই নানা চিন্তা ভিড় করছে, সেগুলো কত ভয়ংকর ভাবা যায় না, প্রথমত আমি ধর্ষিতা, ধর্ষণে অন্তঃস্বত্বা। স্বামী অসুস্থ, হসপিটাল বেডে দু মাস শয্যাশায়ী, বাঁচবে কিনা জানি না। কমলা ছাড়া আমাকে দেখার কেউ নেই। যদি স্বামী মারা যায় তাহলে বিধবার সন্তান সম্ভবনাকে ঘিরে সন্দেহজনক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে! —বিক্ষিপ্ত ও বিমূঢ় মন নিয়ে স্বামীকে একটা অনভিপ্রেত প্রশ্ন করেই ফেললাম, 'আমাদের এখনও সন্তান নেই বলেই কি, তুমি ধর্ষণকে এই ক্ষেত্রে আশীর্বাদ মনে

করছ ? ঠিক করে বলত, কি চাইছ তুমি? ধরতে পারছি না!' দেখলাম ওর দৃষ্টিভঙ্গিতে ও অটল, এক চুলও সরছে না, বরং দার্শনিক কথা বলে অনেক কিছু ঢেকে রাখতে চাইছে, ও বললে, 'না, না, ধর্ষণও একটা ক্রিমিনাল অফেন্স। বলতে দ্বিধা নেই, এই কর্মে যারা যুক্ত তারা কড়া শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। সেই সঙ্গে ভ্রূণকে হত্যা করাটাও আমার চোখে অন্যায়। যে কারণেই হোক না কেন তাকে তুমি নৈতিকতার দিক থেকে মারতে পার না। আমি জানি অ্যাবোরশন করার অধিকার তোমার আছে, কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত একক ভাবে নেওয়াটাকে আমি পছন্দ করি না।' এ সবকথা শুনে তখনও ঠিক করতে পারছি না কি করব? আমি বললাম, 'কি বলছ তুমি? ভেবে চিন্তে বলছ তো! আনওয়ান্টেড চাইল্ড' কথাটা তুমি কি কোনো দিন শোনোনি?' ও বললে, 'না ওটাও, আমার অভিধানে নেই, পৃথিবীতে আমরা যে খুব 'ওয়ান্টেড জীব' এটাই বা কে বললে? তর্ক করো না, কালকে একটা ছবি তুলে আনবে, আমি নামও ঠিক করে রাখব, যদি মেয়ে হয় সেটাই রেখো।'

আমি বললাম 'এই অবস্থায় তোমার এত কথা বলা ঠিক নয়, এত দুর্বল শরীরে এত উত্তেজিত হলে ক্ষতি করবে— যাচ্ছি। কালকে তোমার আবার এক্সরে হবে, সেই ব্যাপারে ডাক্তারের সাথে কথা বলে নেব, ঘুমাও, চিন্তা করো না' ট্রেনে ট্রেনে যেতে যেতে ওর কথা ভাবছিলাম, বাচ্চাটাকে রাখার জন্য এত মায়া কোথা থেকে আসে!' অথচ ও তো বাচ্চাটার বাবাও নয়, এত বড়ো মানবিক হৃদয় কোথা থেকে পেল। শুধু রক্তের সম্পর্কেই পিতৃত্ব গড়ে ওঠে না, মনেরও একটা বিশাল ভূমিকা আছে— এ কথা যেন প্রথম শুনলাম। ট্রেনে বসে ঠিক করলাম, ঠিক আছে রাখব। বাড়িতে ঢুকেই কমলাকে বললাম, 'এক কাপ গরম চা দে তো, ক্লান্তি লাগছে, দাঁড়া স্নানটা আগে সেরে আসি।' চা খেতে খেতে কমলাকে বললাম, 'ভালো

খবর আছে, আমি মা হতে চলেছি, তোকে বলা হয় নি, কাউকে এখন কিছু বলিস না।' 'ভালো কথা বৌদি, বাচ্চা কে আমিই দেখতে পারব, মনে হচ্ছে কাজটা আমার অনেকদিন থাকবে', বলে কমলা হেসে উঠল।

পরের দিন হসপিটাল পৌঁছাতে বেশ দেরি হয়ে গেল, ডাক্তারের জন্য, চিন্তায় ছিলাম দেখা হবে কি না, দেখলাম ডাক্তার বসে আছেন, সম্ভবত আমার জন্যই ছিলেন, কথা হল, বললেন, 'এক্সরে রিপোর্ট ভালো নয়, আমার মনে হয় অন্য কোথাও নিয়ে যেতে হবে লাংসের অবস্থা ঠিক দেখছি না। শুনলাম কালকে আপনার স্বামী অনেক কথাবার্তা বলেছেন, সিস্টাররা সব বলাবলি করছিল। তার মানে এই নয় যে উনি খুব সুস্থ, সুন্দর কথা বলেন জানি, ভালো মানুষ, ওনাকে ধরে রাখার চেষ্টা করব, হাল ছাড়িনি, ঠিক আছে স্বামীর কাছে গিয়ে বসুন, আপনার খোঁজ অনেকক্ষণ ধরেই নিচ্ছিলেন!'

খুব হতাশ লাগছিল। ডাক্তারের চেম্বার থেকে সোজা বেরিয়ে গিয়ে স্বামীর কাছে চলে গেলাম, ঊনিশ নম্বর বেডে, গিয়ে দেখি আমার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে আছে, দেখেই বললে, 'নাম ঠিক করে ফেলেছি স্বাতী, কি মেয়ে তো? রিপোর্ট কী বলছে? তাই তো!' আমি কৌতুক করে বললাম, হ্যাঁ, কী নাম রাখলে শুনি! ও বললে 'কি আশ্চর্য, স্বাতী! তোমার এই হাসিমুখখানা দেখব বলে বসে আছি, সারা রাত ঘুমতে পারিনি, কেন জানো? তুমি, কী করে বসবে, তা তো আমি জানি না, অন্তত এই ক্ষেত্রে! একটা সিদ্ধান্ত মানুষের জীবনে কী পরিবর্তন আনতে পারে তা আগে থেকে কিছুই আঁচ করা যায় না স্বাতী, 'আমি বাঁচব কি না জানি না, একটা অনুরোধ আমার রয়ে যাবে, তুমি আমার ভাবধারায় মেয়েকে মানুষ কোরো! দেখো নামের কোন জাত, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি হয় না। নাম নিয়ে তো কেউ জন্মায় না, আমরা দিই! এখানে তুমি দোষ ধরো না, ওর দুটো নাম রেখেছি, দুটোই

অ্যারাবিক শব্দ, মানেগুলো ভিন্ন, অথচ খুব সুন্দর অর্থ। ভালো নাম আয়েশা। ডাক নাম রেখেছি তিশা। আয়েশা কথাটার অর্থ হল জীবন। আর তিশা মানে প্রাণবন্ত, ও যেন জীবন পায়, ও যেন প্রাণবন্ত হয়। সেটাই বোঝাতে চেয়েছি স্বাতী। কী স্বাতী! কিছু বলছ না কেন? কেমন হল! কী জানি কেন! আজকে তোমাকে প্রাণভরে স্বাতী, স্বাতী বলে ভীষণ ডাকতে ইচ্ছে করছে।'

জামাগুলো অসম্ভব ঢিলে, শরীরে কিছু নেই, উজ্জ্বল মায়াবী চোখ গুলো যেন ভেসে বেড়াচ্ছে, দেখে এত কষ্ট হচ্ছিল— ভেবে পাচ্ছিলাম না, কী বলব। নামটা থাকবে, কিন্তু ও হয়তো থাকবে না— এটা ভেবে বুকটা ফেটে যাচ্ছিল। অথচ, ও যে এত সহজ সরল ভাবে, এক অযাচিত গর্ভস্থ কন্যা শিশুর নামগুলো যে ভাবে বলে যাচ্ছিল মনে হচ্ছিল যেন আমরা দুজনে পার্কে বসে আছি। জড়তা না রেখে একটু উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে উঠলাম, 'অপূর্ব! ঠিক আছে, এবার ফলের রসটা খাও।'

'নাম ঘোষণার ঠিক পনেরো দিন পরে পরেশ বাবু চলে গেলেন, আর তিশার জন্ম হলো আরও সাত মাস পরে।'

তিশা চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'মা আর বলো না, আমি আর পারছি না! অনেকক্ষণ ধরে আমি কান্নাকে ধরে রেখেছি, হৃদয়ের সমস্ত ব্যথা, আমার অশ্রুর মধ্যে আর কতটুকু জমা থাকে মা? ছাব্বিশ বছর জীবনের একটি পিতৃহীনা মেয়ের সমস্ত দুঃখ আজ মুছে গেল, আগে কেন বলোনি মা! আমার সমস্ত সত্ত্বার মধ্যে বাবার অস্তিত্বকে উপলব্ধি করছি, আমি যে এই পৃথিবীতে এসেছি রয়েছি তার খোঁজ যেন আমার অপরিদৃষ্ট পিতৃদেবের মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। আমি কোন দিনই ঈশ্বর বিশ্বাস করিনি। আজ মনে হল এক জাগ্রত ঈশ্বরকে উপলব্ধি করলাম। অফিসের, সমাজের, সকলের পরেশবাবুকে মনে হল, তিনিই আমার ঈশ্বর, তিনিই আমার পিতা, তিনিই আমার

বাবা, মাত্র পাঁচ ছয় বছর যাঁর সান্নিধ্যে তুমি ছিলে আমি তার নখের যোগ্য নই। এত বড়ো নারীবাদী আমি পাইনি। তুমিও তো কম যাও না মা', বলে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। আমি বললাম, 'আর কাঁদিস না মা। জয়, তুমি তিশাকে ধর— ও ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে।'

'ঠিক আছে, মাসিমা' বলে জয়, তিশাদিকে ভিতরের ঘরে নিয়ে গেল।

আমি বললাম, 'জয়! তারপর কী হলো! এত দেখছি গ্রিক ট্র্যাজেডির নয়া সংস্করণ! আয়েশা দেবীর জন্য ভীষণ দুঃখ হচ্ছে রে!' জয় বললে, 'পৃথিবীর অনেক সত্য ঘটনা, অনেক ইতিহাসই থাকে যা বাইরে থেকে দৃশ্যমান নয়, চাপা কান্নায় মোড়া, তোর দুঃখ কিন্তু আমি তৈরি করিনি, অভি! এবার ওঠ।'

গোপালদাকে টাকাটা দিয়ে, বাজারের শূন্য থলিগুলো হাতে নিয়ে যে যার মতো গৃহ অভিমুখে যাত্রা করলাম।